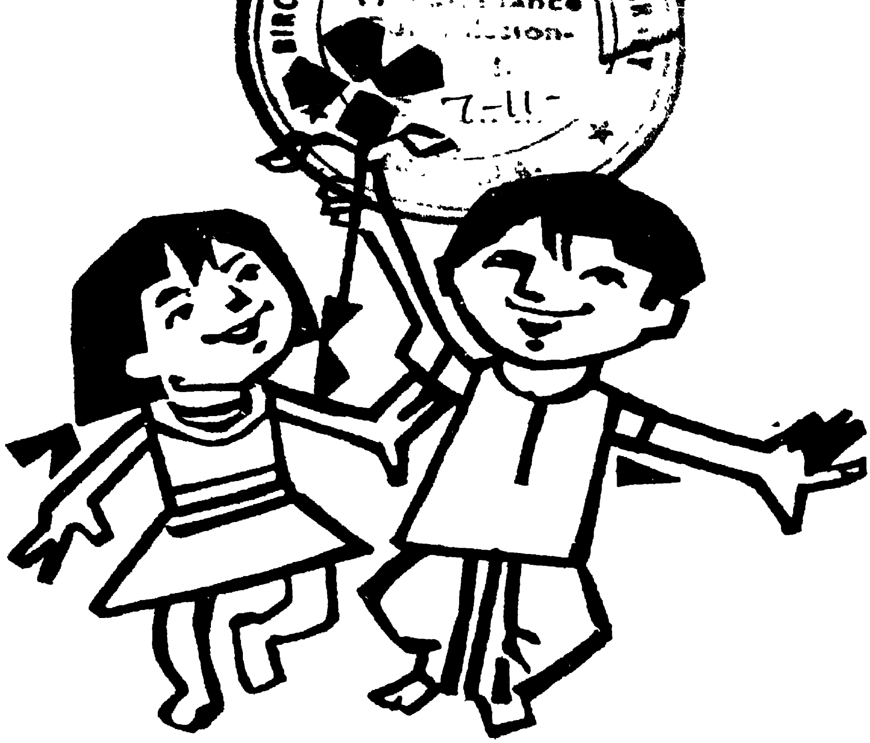
# রোশনাই

সম্পাদনায় : গীতা দত্ত

শৈলশেখর মিত্র ❑ অশোককুমার মিত্র





এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ❑ কলকাতা-সাত

প্রকাশিকা
শ্রীমতী গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ-১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ◻ কলকাতা ৭০০ ০০৭

লিপি বিন্যাস
এ পি সি লেজার
৬১ মহাত্মা গান্ধী রোড ◻ কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রণ
শ্রী কার্তিক কুণ্ডু ও শ্রী তরুণ কুণ্ডু
ইউনিক কলার প্রিন্টার্স
২০এ পটুয়াটোলা লেন ◻ কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
বিমল দাসের ছবি অবলম্বনে
প্রণবেশ মাইতি

পুস্তানির ছবি
পূর্ণেন্দু পত্রী

বাঁধাই
মালক্ষ্মী বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মূল্য
১০০.০০

# আমাদের কথা

'নির্বাচিত রোশনাই'-এর জন্যে লেখা বাছাই করার সময় কত কথাই মনে পড়ছিল। মনে পড়ছিল 'রোশনাই' পত্রিকার জন্ম-লগ্নের কথা, মনে পড়ছিল 'রোশনাই'-এর পথ চলার ইতিহাস, মনে পড়ছিল 'রোশনাই' বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা। আজকের এ লেখা তাই 'রোশনাই'-এর স্মৃতি রোমন্থনেরই ফসল।

১৩৬৬ সালে এশিয়া পাবলিশিং-এর কর্ণধার মৃণাল দত্ত বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে স্থির করেন ছোটদের জন্যে একটি সুন্দর সুষ্ঠু মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করলে ছোটদের কাছে সাহিত্যের অনেক নতুন উপকরণ পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর হবে। নতুন সম্ভাবনাময় লেখকরাও সুযোগ পাবেন তাঁদের মুনশীয়ানা দেখানোর। পত্রিকা প্রকাশ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে পত্রিকার কি নাম হবে তাই নিয়ে চলে চিন্তা ভাবনা—শেষে শ্রদ্ধেয় কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রস্তাবিত 'রোশনাই' নামই গৃহীত হয়।

প্রথম বছরে প্রস্তুতি পর্বে নিজেদের সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র একটি বাঁধাই করা বার্ষিক 'রোশনাই'-এর শোভন সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। সম্পাদক হন রমেন দাস। পরের বছর থেকে রমেন দাসের সম্পাদনায় মাসিক 'রোশনাই' নিয়মিত প্রকাশ হতে থাকে। এক বছর পরে 'রোশনাই'-এর সম্পাদনার ভার নেন গীতা দাশ। তখন থেকে 'রোশনাই' আকারেও কিছুটা বড় মাপের হয়।

দেখতে দেখতে 'রোশনাই' নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলে বহু সাহিত্যিকরা 'রোশনাই'-এর কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের আসরে এসে উপস্থিত হতেন। প্রায়ই শিবরাম চক্রবর্তী এসে আসর জমিয়ে দিতেন। আসর জমাতে শিবরাম চক্রবর্তী ছিলেন একাই একশ। আসতেন শৈল চক্রবর্তী, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অ.কৃ.ব, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজিৎ বসু, স্বপন বুড়ো, ধীরেন্দ্রলাল ধর ছাড়াও আরও অনেক স্বনামখ্যাত ব্যক্তি যাঁরা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। এঁদের স্নেহ-ভালবাসা কোনদিনও ভোলবার নয়। 'রোশনাই'-এর পক্ষ থেকে এঁদের জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা।

শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে একসময় আমাদের সঙ্গে ছিলেন দিলীপ দে চৌধুরী। তাঁর সুচিন্তিত কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর কিছু পুরনো 'রোশনাই'-এর পাতায় আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। দিলীপ দে চৌধুরীর মতই শুভানুধ্যায়ী লেখক বন্ধু বিশ্বনাথ দে, জ্যোর্তিময় গঙ্গোপাধ্যায়কেও আমরা অকালে হারিয়েছি। এঁরা আজ আমাদের মধ্যে না থাকলেও এঁদের অবদান 'রোশনাই' কোনদিনও ভুলবে না।

বর্তমানের বহু প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের সাহিত্য চর্চা শুরু হয় এই 'রোশনাই' পত্রিকাতেই।

'রোশনাই' তার বিশ বছরের জীবনে বহু লেখকের বহু লেখাই প্রকাশ করেছে। সেইসব লেখা থেকে বাছাই করে এই 'নির্বাচিত রোশনাই' গ্রন্থটি প্রকাশ করা হল। এই সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ায় বহুলেখকের বহু ভাল ভাল লেখা চিরকালের মত হারিয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা পেল।

'রোশনাই'-এর নানা বিভাগের মধ্যে 'যে লেখা পুরনো হয় না' বলে একটি বিভাগ ছিল। যে বিভাগে নামি লেখকদের কালজয়ী রচনা পুনর্মুদ্রিত হত। আমরা এই সংকলনের জন্যে সেই বিভাগ থেকে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী প্রভৃতি দু-চার জন খ্যাতনামা লেখকদের রচনাও আবার নির্বাচিত করেছি।

কিছুদিনের জন্যে একবার 'রোশনাই'-এর কার্যালয় কলেজ স্ট্রিট মার্কেট থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়। এই স্থান পরিবর্তনের সময় কিছু নথি-পত্র এদিক-ওদিক হয়ে যায়, যার ফলে 'রোশনাই'-এর দু বছরের অফিস কপি পরে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই সেই সব হারিয়ে যাওয়া 'রোশনাই' সংখ্যার কোন লেখা এই গ্রন্থে সংকলিত করতে না পারায় আমরা অত্যন্ত মর্মাহত।

আমাদের অতীত দিনের ছোট্টো গ্রাহক ও পাঠক বন্ধুরা যারা একদিন 'রোশনাই' পড়ে আনন্দ পেত,

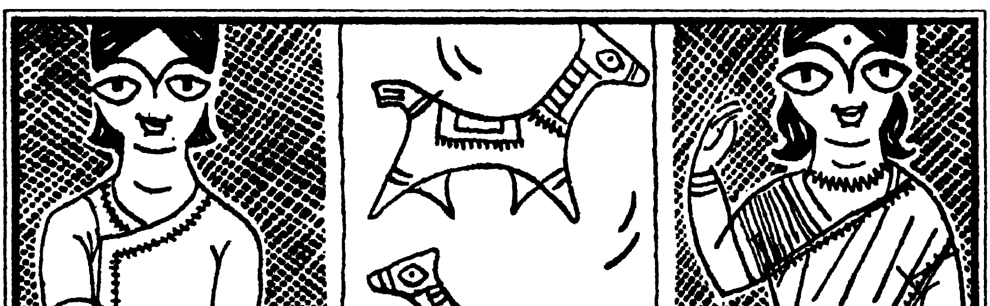
যাদের সেই আনন্দই ছিল আমাদের উৎসাহের উৎস আজ সেইসব বন্ধুরা 'নির্বাচিত রোশনাই' হাতে পেয়ে নিশ্চয় খুশি হবে। খুঁজে পাবে তাদের হারানো দিনের অনেক গল্প-গাথা।

'রোশনাই'-এর কথা চিন্তা করতে-করতে মনে পড়ে যায় 'রোশনাই'-এর সেই সব বাৎসরিক উৎসবগুলির কথা। মনে পড়ে যায় সি. এল. টি-এর 'লাল নূপুর' নাটকের কথা, শৈলেন ঘোষের 'অরুণ বরুণ কিরণমালা' নাটকের কথা, শৈল চক্রবর্তীর' পুতুল নাচ'-এর দৃশ্যের কথা, শিবরাম চক্রবর্তীর সেই অবিস্মরণীয় ভাষণের কথা এবং আরও বহু ঘটনার মেদুর স্মৃতি।

'রোশনাই' প্রকাশিত হওয়ার পিছনে মৃণাল দত্তের নিষ্ঠা ও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল মূলধন। ধীরে-ধীরে মৃণাল দত্ত তাঁর 'ভ্রমণ সঙ্গী' ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশনায় অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ায় কর্ণধারের অভাবে 'রোশনাই' বেহাল হয়ে পড়ে ১৩৫৫ সালে বন্ধ হয়ে যায়।

আমাদের বিশ্বাস ভবিষ্যতে 'নির্বাচিত রোশনাই' বাংলা শিশুসাহিত্যের একটি প্রামাণিক দলিল হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করবে।

গীতা দত্ত ❑ শৈলশেখর মিত্র ❑ অশোককুমার মিত্র



# সূচীপত্র

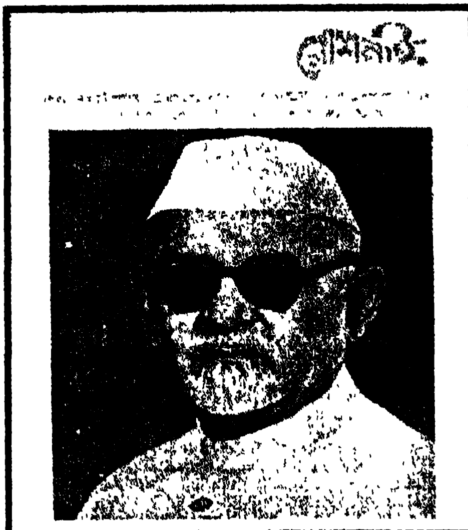
**গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা**
**তোমাদের পাতা**

সর্বজিৎ সেন ❑ হৈমন্তী গোস্বামী ❑ শুভঙ্কর ভট্টাচার্য ❑ পরিতোষ ভক্ত ❑ সুগত সেনশর্মা ❑ অনুপমা মণ্ডল ❑ সিদ্ধার্থ গঙ্গোপাধ্যায় ❑ মৌসুমী ঘোষ ❑ সুবীর ঘোষ ❑ সমরেশ মণ্ডল ❑ কৃত্তিবাস রায় ❑ তপনকুমার সেনগুপ্ত ❑ শুচিস্মিতা দাশগুপ্তা ❑ দীপক চক্রবর্তী ❑ জিয়াউদ্দীন আহমেদ ❑ হিমাংশু সরকার ❑ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ❑ সুহাস মুখোপাধ্যায় ❑ তরুণ দত্তরায় ❑

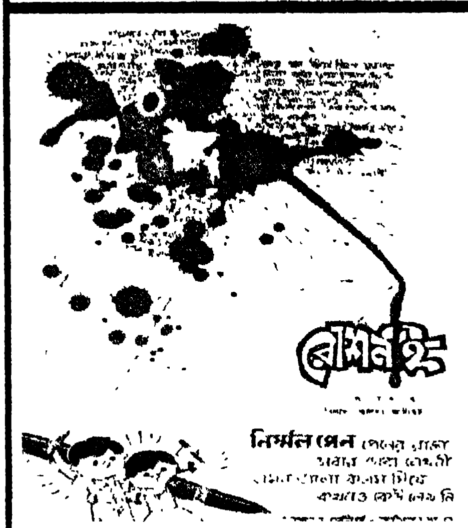
**অলঙ্করণ**

নন্দলাল বসু ❑ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ শৈল চক্রবর্তী ❑ চণ্ডী লাহিড়ী ❑ বিমল দাস ❑ দাশরথী পাল ❑ সুব্রত ত্রিপাঠী ❑ বিদ্যুৎ চক্রবর্তী ❑ মদন সরকার ❑ প্রণবেশ মাইতি ❑ ধীরেন বল ❑ সুবোধ দাশগুপ্ত ❑ সুশীল সরকার ❑ রমেন আচার্য ❑ চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ শৈলশেখর মিত্র ও আরও অনেকে।

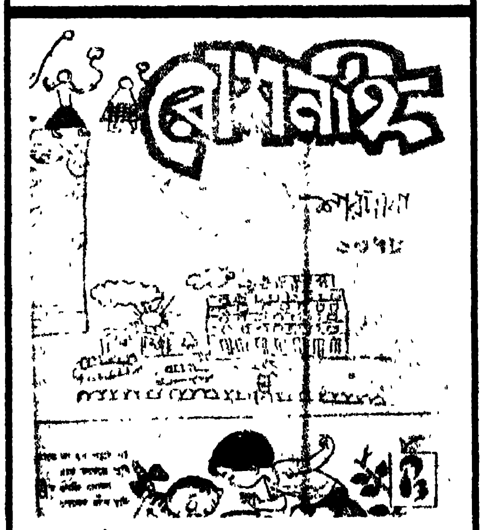













নানান সংখ্যার রোশনাই-এর প্রচ্ছদ চিত্র




# কলাভবন

অন্নদাশঙ্কর রায়

রাঁচীধামে করলে গমন
　　দেখতে যাব তূর্ণ,
নগেনদাদার কলাভবন
　　ষোলকলায় পূর্ণ।
কোন কলাটা সিঙ্গাপুরী
　　কোনটা যে মাদ্রাসী,
চিনব বলেই মুখে পুরি
　　কোনটা কানাইবাঁশি।
ষোলোরকম কলার তিনি
　　পরম অনুরক্ত,
তাঁরই কথায় টিকিট কিনি
　　আমি কলার ভক্ত।

[আশ্বিন, ১৩৬৬]




নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

## প্রথম দৃশ্য

একটি থিয়েটার স্টেজ। পেছনে একটা জঙ্গলের সিন খাটানো। ডিরেক্টার—মানে নাটকের পরিচালক কালুদা খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে এসে ঢুকল। তাকিয়ে দেখল চারিদিক। আর কাউকে না দেখে রেগে চিৎকার করে উঠল।

কালুদা—হবেনা—থিয়েটার হবেনা! এই সমস্ত গোবর-গণেশকে দিয়ে প্লে হয়! আজ হবেনা থিয়েটার—হতেই পারেনা।

[হারাধনের প্রবেশ]

হারাধন—কী হয়েছে কালুদা? অত চ্যাঁচাচ্ছ কেন?

কালুদা—চ্যাঁচাবনা? বলি হারাধন, পেছনে ওটা কি সীন টাঙিয়েছ—শুনি?

হারাধন—কেন—চমৎকার অরণ্যের দৃশ্য বানিয়ে রেখেছি।

কালুদা—অরণ্য! তোমার মুণ্ডু! তুমি একটি গবেট। বুঝেছ, নির্জলা গবেট।

হারাধন—কেন, সীনটা তো দেখতে বেশ। কত মনোরম তরুলতা—কত কুসুম ফুটে রয়েছে—শাখায় শাখায় কত কোকিল সুমধুর স্বরে—

কালুদা—(চেঁচিয়ে) শাট্ আপ! (ভেংচে) তরুলতা কুসুম—কোকিল সুমধুর স্বরে। বলি কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে অরণ্য কোত্থেকে এল—অ্যাঁ? আর তা ছাড়া দ্বৈপায়নহ্রদইবা গেল কোথায়? দুর্যোধন কোথায় লুকিয়ে বসে থাকবে—শুনি?

হারাধন—এই নাও—কথা শোনো একবার। আমি হ্রদ কোথায় পাব? স্টেজ কেটে আমি হ্রদ তৈরী করবো নাকি? বলো তো একটা পুরোনো গঙ্গাজলের ট্যাঙ্ক নিয়ে আসি। তার মধ্যে দুর্যোধন ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকবে।

কালুদা—ইয়ার্কি পেয়েছিস—না? (রেগে) গেট্ আউট—দূর হ সামনে থেকে। (হারাধন চলে গেল) যা হোক, ওই অরণ্য দিয়েই চালিয়ে নিতে হবে এখন। লোকে ধরে নেবে দুর্যোধন জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে বসে ছিল। কিন্তু আর সব হতচ্ছাড়া গেল কোথায়? এই সীনটাতেই দেখছি সব মাটি করে দেবে—একদম ভালো রিহার্সাল হয়নি। (চেঁচিয়ে) এই নিমাই—এই পট্‌লা—

(এক মুখ দাড়ি লাগিয়ে, গায়ে যাত্রার দলের মতো পোশাক পরে নিমাইয়ের প্রবেশ। কালুদা ভীষণ চমকে গেল) আরে—এটা কে রে?

নিমাই—আমি নিমাই।

কালুদা—নিমাই! তা বেশ! কিন্তু কিসের পার্ট করছ তুমি? ধৃতরাষ্ট্রের?

নিমাই—ধৃতরাষ্ট্র কেন হবে? আমি ভীম।

কালুদা—ভীম? তা হলে অমন জগঝম্প দাড়ি লাগিয়েছিস কেন? কে তোকে বলেছে ভীমের অমন [illegible]বশার মতো দাড়ি ছিল?

নিমাই—বারে, দাড়ি গজাবেনা? কদ্দিন ধরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ চলেছে। দিন নেই, রাত নেই—খালি

যুদ্ধ। এর মধ্যে ভীম কখন দাড়ি কামাবে শুনি? পরামানিক পাবে কোথায়?

কালুদা—এঃ এঃ। খুব যে পণ্ডিত হয়ে গেছিস। ভীম দাড়ি কামাবে কেমন করে? কেন, অর্জুন বাণ দিয়ে মেজদার দাড়ি কামিয়ে দেবে।

নিমাই—বাণ দিয়ে?

কালুদা—হাঁ—হাঁ—বাণ দিয়ে। অমন ভীষ্মকেই শরশয্যায় শুইয়ে দিতে পারল আর দাদার দাড়ি কামাতে পারবে না? খোল্—খুলে আয় এক্ষুণি—

[ শ্রীকৃষ্ণ বেশে নিখিলের প্রবেশ ]

নিখিল—কালুদা, দ্যাখোতো সাজ কেমন হল?

কালুদা—আহা—খাসা! এখন গিয়ে কদম্ব বৃক্ষে উঠে বসলেই হয়! এই নিখ্‌লে হাতে আবার বাঁশি নিয়েছিস যে বড়?

নিখিল—বাঃ—শ্রীকৃষ্ণের হাতে বাঁশি থাকবে না?

কালুদা—একি বৃন্দাবন পেলি যে বেণু বাজিয়ে ধেনু চরাবি? এসব অপোগণ্ডকে নিয়ে তো আচ্ছা প্যাঁচে পড়া গেল। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের হাতে কী ছিল মনে নেই? শঙ্খ-চক্র।

নিখিল—শাঁখ দিয়ে কী হবে? আমি বাজাতে পারি না।

কালুদা—তবে কী পারো? চপ-কাটলেট খেতে পারো?

নিখিল—খুব পারি। খাইয়েই দেখোনা একবার।

কালুদা—চোপরাও! খালি পাকামো শিখেছিস। শাঁখ না হল, একটা চক্র তো দরকার।

নিখিল—চক্র আমি নিয়ে এসেছি। দাদার সাইকেলের একটা টায়ার।

কালুদা—কী—সাইকেলের টায়ার! ইচ্ছে করছে তোকে আমি ফায়ার করি। (নিমাইয়ের দিকে তাকিয়ে) তুই যে তখন থেকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস? তোকে বললুম না ওই মোগলাই দাড়ি খুলে আসতে?

নিমাই—তুমি তখন থেকে কেবল আমার দাড়িই দেখছ। আর নিখ্‌লে কেষ্ট সেজেছে, তার জুতো বুঝি তোমাদের চোখে পড়েনি?

কালুদা—আরে অ্যাঁ—তাই তো! এ যে পা-বাঁধা ডার্বি জুতো। নিখ্‌লে!

নিখিল—আমার পা মচকে গেছে। অন্য জুতো পরলে লাগে।

কালুদা—তাই বলে ওই জুতো। তুই পাগল না আমি পাগল?

নিমাই—দুজনেই।

কালুদা—শাট্ আপ। যা, খোল জুতো।

নিখিল—খালি পায়ে নেংচে হাঁটতে হবে আমাকে।

কালুদা—তাই হাঁটবি। নেংচে নেংচেই হাঁটবি।

নিখিল—শ্রীকৃষ্ণ খোঁড়া হয়ে হাঁটবে? লোকে যে—

কালুদা—লোকে যা বলে আমি বুঝব। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ আহত হয়েছে, তাই খুঁড়িয়ে চলছে। হল তো? যা এখন। নিমাই, তুমিও যাও—দাড়ি খোলো গে—

নিমাই—খুলছি। কিন্তু একটা কথা বলব কালুদা?

কালুদা—বলো—চটপট।

নিমাই—আমি বলছিলুম কি—এই থিয়েটারের পর পাঁচ বছর আমাদের কাউকে আর জুতো কিনতে হবে না।

কালুদা—মানে?

নিমাই—মানে এই থিয়েটার দেখে লোকে এত জুতো ছুঁড়বে যে তাতেই—

কালুদা—অ্যাঁ—মশকরা! ঠাট্টা হচ্ছে আমার সঙ্গে? গেট আউট—গেট আউট—

[ নিমাই আর নিখিলের পলায়ন ]

শেম্! এদের নিয়ে থিয়েটার করতে হবে? এর চাইতে যদি দলবল নিয়ে খোল-কর্তাল বাজিয়ে হরি-সংকীর্তন গাইতুম, তা হলেও অনেক বেশি যশ হত। ছ্যাঃ!

[ প্যাঁচার মতো মুখ করে দুর্যোধনবেশী পান্নালালের প্রবেশ ]

তোমার আবার হাঁড়ির মতো মুখ কেন হে পান্নালাল? পেট কামড়াচ্ছে? আমি দেখছি শেষ পর্যন্ত তুই-ই ডোবাবি। তখন তোকে এত করে বললুম, এত তেলেভাজা খাসনি—খাসনি, তা—

পান্নালাল—(খ্যাঁচ্ খ্যাঁচ্ করে) পেট কামড়াচ্ছে কে বললে তোমায়?

কালুদা—তা হলে? অমন তালের আঁটির মতো চেহারা করবার মানে কী?

পান্নালাল—কালুদা, আমি থিয়েটার করব না।

কালুদা—থিয়েটার করবে না—মানে?

পান্নালাল—মানে, করব না।

কালুদা—বাঃ—বাঃ। রসিকতার সময়টি তো ভালো। একটু পরে থিয়েটার আরম্ভ হবে—তুমি দুর্যোধন তোমার উরুভঙ্গ নিয়ে নাটক, এখন বলছ কিনা পার্ট করবে না?

পান্নালাল—দুর্যোধন বলেই করব না।

কালুদা—জ্বালাসনি বলছি পেনো। এমনিই আমার মেজাজ এখন বেজায় খারাপ। খ্যাঁক-খ্যাঁক করে এখন আমি যাকে তাকে কামড়ে দিতে পারি। কী হয়েছে তোর?

পান্নালাল—ওই নিমাই তা হলে ভীমের পার্ট করবে?

কালুদা—নির্ঘাৎ।

পান্নালাল—আর আমি দুর্যোধন?

কালুদা—নিঃসন্দেহে।

পান্নালাল—অসম্ভব।

কালুদা—মানে?

পান্নালাল—মানে আবার কী? নিমাইকে তো আমি এক ল্যাং মেরে পটকে দিতে পারি। আর ও-ই শুঁটকে ফড়িংটাই কিনা আমার উরু ভঙ্গ করবে?

কালুদা—মহাভারতে তাই লেখা আছে।

পান্নালাল—মহাভারত-টহাভারত আমি বুঝি না। মোদ্দা, ওই রোগা পট্‌কা নিমেকে আমার উরুভঙ্গ করতে দেব না। কিছুতেই না।

কালুদা—কী মুস্‌কিল। বলি, মামাবাড়ির আবদার পেলি? রিয়ার্সেলের সময় বললি না কেন?

পান্নালাল—বলেছিলুম তো। তুমি তখন আমাকে ভুজুং ভাজুং দিয়ে বোঝালে আমার নাকি হিরোর পার্ট। এখন দেখছি সব বোগাস্। আমি হিরো না ছাই। উরুভঙ্গ হয়ে আমি মাটিতে পড়ে হাহাকার করব—আর নিমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তড়পাবে, জাঁক দেখাবে। উঁহু, ইম্‌পসিব্‌ল্!

কালুদা—ইম্‌পসিব্‌ল্! (দাঁত খিঁচিয়ে) দ্যাখ্ পেনো—অনেকক্ষণ ধরে তোর বাঁদরামো সহ্য করেছি আমি। একটু পরে প্লে আরম্ভ হবে আর এখন উনি এলেন ধাষ্টামো করতে? যা—রেডি হ শিগ্‌গীর—নইলে এক চড়ে কান ছিঁড়ে দেব। বেরো—যা শিগ্‌গির 'গিরীন রুমে'—

পান্নালাল—(খানিকক্ষণ গোঁজ হয়ে থেকে) আচ্ছা বেশ, দেখা যাবে।

(বেরিয়ে গেল)

কালুদা—এদের নিয়ে আমায় থিয়েটার করতে হবে! ছ্যা—ছ্যা। এর চাইতে যদি ঢোল বাজিয়ে 'রামা হো রামা হো' গাইতুম, তা হলেও নাম হত। যত সব বেকুবের কারবার। (সামনের দিকে তাকিয়ে জিব্ কেটে) অ্যাঁ—মেলা অডিয়েন্স্ এসে গেছে যে! এই ড্রপ্ ফ্যাল—ড্রপ্ ফ্যাল! প্লে আরম্ভ করতে হবে।

(ড্রপ পড়ল)

## ।। দ্বিতীয় দৃশ্য ।।

[ ড্রপ উঠল। সেই অরণ্যই রয়েছে পেছনে। গদা হাতে দুর্যোধন—অর্থাৎ পান্নালাল পায়চারী করছে। ]

দুর্যোধন—আজি লুকাইয়া দ্বৈপায়ন হ্রদে, কুরুক্ষেত্র রণ হতে পলাতক আমি। না-না—এতো হ্রদ নয়—এ যে বনভূমি কালুদা বলিয়াছে মোরে।

(প্রম্পটার উইংসের পাশ থেকে গলা বের করল)

প্রম্পটার—এই—কী বলছিস এ-সমস্ত? ঠিকমতো পার্ট কর!

দুর্যোধন—চোপরাও! আমি দুর্যোধন—
ভাঙিবে উরু—ওই নিমে?
হাঃ—হাঃ— হাঃ—পায় অট্টহাসি—
আসুক অর্জুন এইখানে একবার।
পাবে টের মজা কারে বলে!

(উত্তেজিত প্রম্পটার স্টেজে প্রায় ঢুকে গেল)

প্রম্পটার—এই পেনো—কী হচ্ছে? ভালো করে পার্ট বল্ শিগ্‌গীর—

দুর্যোধন—নিকালো হিঁয়াসে। মোরে দিবে উপদেশ! অর্বাচীন যত।

[ শ্রীকৃষ্ণের সাজে খোঁড়াতে খোঁড়াতে নিখিলের প্রবেশ ]

শ্রীকৃষ্ণ—মহামানী দুর্যোধন—
এতদিনে বুঝেছ কি তুমি
অধর্মের জয় নাহি হয়?
বুঝেছ কি—

দুর্যোধন—কে রে ওটা? খোঁড়া কেষ্ট? (হেসে)
খোঁড়া ল্যাং ল্যাং ল্যাং
কার বাড়িতে গিয়েছিলি
কে ভেঙেছে ঠ্যাং? হাঃ—হাঃ—হাঃ—

প্রম্পটার—এই সেরেছে—দিলে সব ডুবিয়ে। এই পেনো—থাম্ থাম্—ওসব নয়—

দুর্যোধন—কী! বার বার হাঁসের মতন

করিস প্যাঁক প্যাঁক?
বহুক্ষণ সহিয়াছি তোর এ ধৃষ্টতা
রে বর্বর! এইবারে পাবি সমুচিত প্রতিফল—
[ প্রম্পটারের গলা ধরে টেনে এনে সজোরে পদাঘাত ]

প্রম্পটার—ওরে বাপরে, গেলুমরে—মেরে ফেললে রে —
(বই আর বাঁশি ফেলে সবেগে পলায়ন)

দুর্যোধন—তারপর খোঁড়া কেষ্ট? কী মতলবে হেথা আগমন?

শ্রীকৃষ্ণ—(ফিস্‌ফিসিয়ে) মাইরি ভাই পান্নালাল—কী আরম্ভ করলি তুই। থিয়েটার যে মাটি হয়ে গেল। ওই দ্যাখ্—সামনে অডিয়েন্স হাসছে।

দুর্যোধন—হাসুক—হাসুক যত খুশি।
আমি নাহি করি ভয়।
রাজা দুর্যোধন আমি— হাতে মোর গদা।
ওরে ল্যাং ল্যাং খোঁড়া কেষ্ট,
কী বুঝাস মোরে?

শ্রীকৃষ্ণ—(ফিস্‌ফিসিয়ে) আঃ—কী করছিস! ঠিক মতো বলে যা। নে আমি আরম্ভ করছি : (জোরে) শোনো রাজা দুর্যোধন,
যত পাপ করিয়াছ— এবে তার
হইবে বিচার।
ওই হেরো ধূ-ধূ জ্বলে রাশি রাশি
লেলিহান শিখা—
ওই শোনো আর্তনাদ!
খেলিয়া কপট পাশা পাণ্ডবেরে দিলে নির্বাসন
মহাপাপ সঞ্চিলে কত না—
আজ তাই তোমারে অন্তিম দণ্ড দিতে—

দুর্যোধন— এঃ, খুব লেকচার দিচ্ছিস! তবু যদি খোঁড়া না হতিস! হেঁঃ-হেঁঃ-হেঁঃ!
[ টেনে টেনে হাসি ]

শ্রীকৃষ্ণ—(ফিস্‌ফিসিয়ে) মাইরি পেনো, খামোকা সব মাটি করে দিসনে। আমায় বলতে দে— (জোরে) তোমারে অন্তিম দণ্ড দিতে ওই আসে ভীম সেন! হও হে প্রস্তুত—নামিছে তোমার 'পরে কালের বিচার!
[ গদা হাতে ভীমের প্রবেশ ]

ভীম—রে রে রে রে পামর!
এইবারে কোথায় পালাবি? পাইয়াছি তোরে।
সমুচিত দণ্ড দিব এবে।
আয় রণে—গদাযুদ্ধ করি তোর সনে।

দুর্যোধন—হাঁ, হাঁ, ওরে নিমে, এবার আমিও পেয়েছি তোকে।
হা-রে-রে-রে-রে-রে—
গদাযুদ্ধ আমার সঙ্গে?
বোঝ্ ঠ্যালা!
[ গদা হাতে ভীমের প্রবেশ ]
[ গদাম্ করে গদা দিয়ে এক বিরাট ঘা বসাল নিমাইয়ের পিঠে ]

ভীম—অ্যাঁ—একি! আমাকে মারলে যে বড়? এরকম তো কথা ছিল না।

দুর্যোধন—চোপরাও! রোগা পটকা নিমে—ভাঙিবে আমার উরু! (বিচ্ছিরি মুখ করে) অ্যাঃ—ভীম। তোর ম্যাতো অনেক ভীমকে আমি গিলে খেতে পারি। বুঝেছিস? যা—যা! (গদা দিয়ে ভীমকে আর এক ঘা; নিমে ঠেকাতে গিয়েও পারল না—উঃ করে চেঁচিয়ে উঠল)

শ্রীকৃষ্ণ—একি কাণ্ড! দুর্যোধন—একি ব্যবহার?
কথা আছে ভীম ভাঙিবে তব উরু।
তুমি কেন ভাঙিতেছ পিঠ তার—
কহ, কোন্ অধিকারমদে হেন কার্য করিতেছ?

দুর্যোধন—ওঃ—তুমি আবার ওর হয়ে ওকালতি করতে এসেছ!
ওরে—ওরে খোঁড়া কেষ্ট, ওরে ধড়ীবাজ—দাঁড়া তবে। দিব দেখাইয়া কত ধানে কত চাল হয়।
(দড়াম করে শ্রীকৃষ্ণকে গদাঘাত : শ্রীকৃষ্ণের সবেগে পতন এবং তার চাইতেও বেগে উত্থান।)

শ্রীকৃষ্ণ—ওরে বাবারে! কালুদা—(খোঁড়াতে খোঁড়াতে দ্রুত প্রস্থান)

দুর্যোধন—যা, নিয়ে আয় ডেকে—
তোর কালু-আলু-কলা-মূলো যা যেখানে আছে—
সবারে করিব আমি ঠাণ্ডা,
খাইব চিবায়ে কচ্‌কচ্।
(এই ফাঁকে নিমাইও পালাচ্ছিল, খপাৎ করে তার কাঁধ চেপে ধরল দুর্যোধন) এই ভীম সেন, পালাস কোথায়?

ভীম—ছেড়ে দাও আমাকে। আমি আর গদাযুদ্ধ করবনা তোমার সঙ্গে।

দুর্যোধন—গদাযুদ্ধ করবিনা—বললেই হল? ভীম হয়েছিস না?

দাঁড়া এবে—
তোর যত লম্ফঝম্ফ—সমস্ত ওস্তাদী এবার করিব শেষ—

(বলেই গদা তুলে দমাদ্দম পিটতে শুরু করল ভীমকে। নিমাই দু-একবার ঠেকাতে চেষ্টা করে শেষে মাটিতে পড়ে গেল, তারপর জুড়ে দিলে পরিত্রাহি চিৎকার)

ভীম—কালুদা—বাঁচাও—বাঁচাও! এই হতচ্ছাড়া পেনোটা ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে আমাকে মেরে ফেললে—

দুর্যোধন—রেখে দে তোর কেলোভুলো, কলামুলো—
পিটিয়ে পিটিয়ে তোকে করে দেব তুলো—

(আবার ধপাধপ গদাঘাত, নিমাইয়ের আর্তনাদ)

ভীম—কালুদা—কালুদা—

দুর্যোধন—কালুকে করিব আমি আলুসেদ্ধ!

(কালুদা, প্রম্পটার, আরো দু তিনজনের বেগে প্রবেশ)

কালুদা—ভয় নাই—ভয় নাই—ভীম বধ হতে নাহি দিব।
সৈন্যগণ—চেপে ধরো এই পাষণ্ড দুর্যোধনের ঠ্যাং—
ফেলে দাও চিৎ করে
অবিলম্বে ভূমিতলে।

(সকলে মিলে দুর্যোধনকে ধরে ফেলল, তারপর ফেলে দিলে মাটিতে। এর মধ্যে দুর্যোধন বেশ কয়েক ঘা বসিয়েছে সকলকে। কালুদা তার গদাটা কেড়ে নিলে।)

দুর্যোধন—ছাড়ো—ছাড়ো—ধর্মযুদ্ধ করো—
এসো একে একে,
সবে মিলে কেন ধরো ঠেসে?

(নিমাই ওরফে ভীম তখন যুৎ পেয়ে দু ঘা লাগাল দুর্যোধনকে)

ভীম—হা-রে-রে-রে-রে-রে দুর্যোধন,
এবার কেমন লাগে?

দুর্যোধন—স্তব্ধ হও কাপুরুষ! (চিৎকার করে) দেখলেন মশাইরা, দেখলেন! ব্যাটা ভীমকে দিয়েছিলুম ঠাণ্ডা করে—সবাই মিলে কিভাবে আমায় বিধ্বস্ত করলে—দেখলেন? এটা কিরকম ব্যাভার হল অ্যাঁ? ও মশাইরা, ও অডিয়েন্সের ভদ্রলোকেরা, দেখলেন তো একবার?

কালুদা—থাক—থাক—খুব হয়েছে! প্লে করতে এলুম দুর্যোধনের উরুভঙ্গ—বানিয়ে দিলে ভীমবধ! এদের নিয়ে থিয়েটার হয় মশাই? এর চাইতে যদি খোল-কর্তাল নিয়ে কালীকেত্তন গাইতুম, অনেক ফল হত এর চেয়ে। থিয়েটার এই পর্যন্তই থাক। এই, ড্রপ ফ্যাল্ ড্রপ ফ্যাল—

[ আশ্বিন, ১৩৬৬ ]

।। যবনিকা পতন ।।



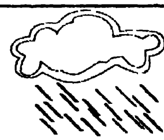
## ক্লাস পালিয়ে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ক্লাস পালিয়ে ক্লাস পালিয়ে ক্লাস পালিয়ে নারান
ক্লাস পালাবে এখন কী করে!
নিজেই এখন অধ্যাপকের বৃত্তি নিয়ে নারান
উঠেছ সেই শৈলশিখরে!
যেখান থেকে কেউ কখনও আর
রাস্তা খুঁজে পায় না পালাবার!
এবার নিজের ক্লাসের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়ে নারান
দেখব তুমি পালাও কী করে!

ক্লাস পালিয়ে ক্লাস পালিয়ে ক্লাস পালিয়ে বিমল
ক্লাস পালাবে এখন কী করে!
সরকারি পাকদণ্ডি বেয়ে করলে কী এ বিমল
উঠলে গিয়ে শৈলশিখরে!
যেখান থেকে কেউ কখনও আর
রাস্তা খুঁজে পায় না পালাবার!
এইবারে লালফিতের বাঁধন এড়িয়ে গিয়ে বিমল
দেখব তুমি পালাও কী করে!

[ আশ্বিন, ১৩৬৬ ]





## তুফান

নরেন্দ্র দেব

তুফান আনো, তুফান আনো,
পাতাল চিরে কৃপাণ হানো;
গাঁয়ের মজা নিথর গাঙে
অচল তরীর নোঙর তোলো,
ভাঙুক যদি জাঙাল ভাঙে।
শিকল ছেঁড়ো, বাঁধন খোলো—
শিরদাঁড়াটা দাঁড়াক রুখে
ফুলিয়ে পেশী চওড়া বুকে
হেঁইয়ো হেঁইয়ো হাকাও নাও
এগিয়ে চলো কিনার ছেড়ে
দাবিয়ে ঘোরো দরিয়া ফেঁড়ে,
হালের পানি নাই বা পাও।

হাজার দাঁড়ে হাজার টানে
তর তরিয়ে হাওয়ার পানে
জোয়ান তরী ছুটুক বেগে—
উঠুক ভাটিয়ালীর গানে
সারি জারির ছন্দে প্রাণে
সুরের শিখা উঠুক জেগে!
ঝাঁপিয়ে পড়ো ঝড়ের রাতে
লাফিয়ে পড়ো ঝড়ের রাতে
'বদর বদর' আওয়াজ ধরি।

তুফান যদি প্রলয় আনে
বৈঠা ধরো শক্ত টানে
আশার পালে ভাসাও তরী!

[ ভাদ্র, ১৩৬৭ ]

# সামান্য আংটি

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

সামান্য একটা আংটি মানুষের জীবনে কত কি কাণ্ড ঘটিয়ে দিতে পারে তা জানো কি?

একটি মজার গল্প বলছি শোন ঃ—

অনেকদিন আগের কথা। প্রায় দু'শ বছর আগে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। স্কটল্যান্ডের এক গ্রামে।

এক জমিদার বাড়িতে ছোট একটি ছোক্‌রা চাকর ছিল। তের চোদ্দ বছরের ছেলে, খুব বিশ্বাসী আর চটপটে বলে মনিবরা খুব ভালবাসতেন। একদিন সেই মনিবের এক বন্ধুর বোনের বিয়ে—নিজে যেতে পারবেন না, কিছু উপহার পাঠাবেন এই স্থির করেছিলেন। পাথর বসানো দামী আংটি। বন্ধুর বাড়ি পাশের এক গ্রামে —মধ্যে শুধু একটা নদী। তাও সাঁকো আছে, যেতে আসতে ঘণ্টা দুয়েকের বেশী লাগে না। ঠিক হ'ল, ঐ ছোকরা চাকর—জ্যাক্ তার নাম, সেই গিয়ে বিয়ের দিন সকালে উপহারটা পৌঁছে দিয়ে আসবে।

নির্দিষ্ট দিনে জ্যাক্‌কে ডেকে মনিব আংটিটা দিলেন, 'খুব সাবধানে নিয়ে যেও—দামী আংটি। গিয়ে সোজা আমার বন্ধুর হাতে দেবে, আশা করি দুপুরের মধ্যেই দিয়ে আসতে পারবে।'

সামান্য পথ—তাছাড়া এই সময়টা অত্যন্ত ফাইফরমাশ খাটা থেকে ত অব্যাহতি মিলবে—জ্যাক্ বেশ খুশী হয়েই চল্‌ল, আপন মনে শিষ দিতে দিতে। হাঁটতে হাঁটতে ক্রমশঃ নদীর ধারে এসে পড়ল—সাঁকো পার হলেই পাশের গ্রাম শুরু—খুব জোরে জোরে পা হাঁকালে জ্যাক্। কিন্তু ঠিক সাঁকোর নিচটায় এসে হঠাৎ একবার থমকে দাঁড়াল। আচ্ছা, কেউ ত কোথাও নেই, একবার আংটিটা দেখে নিলে কেমন হয়? কদিন ধরেই ত শুনছি দামী আংটি—খুব ভাল পাথর বসানো, দেখব নাকি একবার খুলে? ক্ষতি কি? ওখানে গিয়ে পড়লে ত আর দেখতে পারবো না। না, একবার সে দেখবেই—যা থাকে কপালে।

ভেলভেট মোড়া বাক্স, তার ওপর একটি পাতলা কাগজ মোড়ানো। আস্তে আস্তে কাগজটা খুলে, বাক্সটাও খুলে ফেললে। কিন্তু আনাড়ী ত, কোনটা বাক্সর সোজা দিক ঠিক বুঝতে না পেরে উলটো করেই খুললে—মানে ডালাটা রইল নিচের দিকে, ফলে টুপ করে আংটিটা গেল পড়ে।

আর পড়ল যেখানে—সেখানে জ্যাক্ দাঁড়িয়েছিল—সেটা নদীর পাড়। তখনই ভাঁটা শুরু হয়েছে নদীতে, এতক্ষণ জোয়ারে জল ছিল সেখানে, সবে সরে গেছে, নরম পাঁক বা কাদা।—তারই মধ্যে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে যে আংটিটা কোথায় ডুবে গেল—আর দেখা গেল না। খোঁজ খোঁজ। মুখ শুকিয়ে উঠল জ্যাকের। অমন আংটিটায় কাদা লেগে গেল, ভাল করে যদি পরিষ্কার করতে না পারে তাঁরা কি মনে করবেন।

কিন্তু সে ত পরের কথা। এখন আংটিটা গেল কোথায়? একি, এইত পড়ল—এই ত এইখানে। আরও মুখ শুকিয়ে উঠল জ্যাকের, কপালে ঘাম দেখা দিল—এতক্ষণ হেঁট হয়ে খুঁজছিল, এবার সেই পাঁকের ওপরই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে পাগলের মত কাদার মধ্যে খুঁজতে শুরু করলে। তন্ন তন্ন করে খুঁজলে—নদীর জল থেকে শুরু করে সেই সাঁকোর ধার পর্যন্ত, ওধারে বড় ওক গাছের তলা—কোথাও নেই। জানে এতদূর আসেনি, আসতে পারে না, তবু খুঁজলে। জলে পড়া সম্ভব নয়, তবু একহাটু জলে গিয়ে পাগলের মত হাতড়াতে লাগল। জামার হাতা ভিজল, পাজামা জলে-কাদায় মাখামাখি, টুপিটা কোথায় পাঁকে পড়ে গেছে—ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। সত্যিই পাবেনা নাকি? কী সর্বনাশ!

সত্যিই কিন্তু পেল না। বেলা বেড়ে যাচ্ছে, এতক্ষণে ওর গিয়ে পৌঁছানো উচিত ছিল। আর একটু পরেই হয়ত খোঁজা খুঁজি শুরু হবে। হয়ত আর খানিকটা দেখে ওঁরা বন্ধুর বাড়ি লোক পাঠাবেন, তখন জানা যাবে যে জ্যাক্ পৌঁছায়নি। তারপর হয়ত ওঁরা পুলিসে খবর দেবেন।

ভয়ে লজ্জায় জ্যাক্ কেঁদে ফেল্‌লে। পাগলের মত নিজের কপাল নিজেই ঠুকতে লাগল গাছের গুড়িতে।

কী হবে, কি করবে এখন?

ফিরে গিয়ে সব কথা বলবে?

তারপর মার এবং অপমান সইবে?

শুধু মার হলেও লজ্জা ছিল না— কিন্তু ওঁরা যে ওকে অবিশ্বাস করবেন, ওঁরা হয়ত মনে করবেন যে সে নিজেই চুরি করে মিছে বলছে সেইটাই যে মর্মান্তিক! না তার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। চোর অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দিলে এমনিইত কোথাও চাকরি পাবে না। সেই মরতেই হবে, না খেয়ে।

আর এত দিনের এত বিশ্বাসের পরে—এই? ছি!

অনেক বেশী বয়সের অত চাকর থাকতেও তাঁরা বিশ্বাস করে ওকেই দামী জিনিসটা দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন—সে তার মর্যাদা রাখতে পারল না? এমুখ সে দেখাবে কি করে? অনেক ভেবে ভেবে সে স্থির করলে যে এমুখ আর সে ওদের সত্যিই দেখাতে পারবে না। তখন আরও খানিকটা বেলা বেড়ে গেছে। এতক্ষণে ওরা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন নিশ্চয়ই। আর মোটে সময় নেই, পালাতে হলে এখনই।

জ্যাক্ উঠে পড়ে উলটো দিক ধরে পাগলের মত দৌড়তে লাগল। কোথায় যাচ্ছে তা কিছুই জানে না, শুধু এটুকু জানে যে ওখান থেকে যতটা দূরে হয় তাকে পালাতে হবে, দৌড় দৌড়—ঘামে সমস্ত জামা ভিজে উঠেছে, পা তার চলছে না, পাগলের মত উদ্‌ভ্রান্ত চোখ মুখ, সমস্ত জামা কাপড় ভিজে আর কাদায় মাখা মাখি, অমনি ভাবে দৌড়চ্ছে, সবাই ভাবল পাগল। কেউ হাসাহাসি করলে, করুণায় কারুর চোখ ছল ছল করতে লাগল, কোনও গ্রামে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এল পাগল ভেবে—কোনদিকে ওর দৃষ্টি নেই, দৌড়চ্ছে ত দৌড়চ্ছেই। হাপরের মত নিঃশ্বাস পড়ছে, কপালের নোনা ঘাম গড়িয়ে জ্বালা করছে—দৃষ্টি হয়ে পড়েছে ঝাপসা। তবু দৌড়তে যে ওকে হবেই।



এমনি করে একেবারে যখন রাত হল, একটা গাছ তলায় এলিয়ে শুয়ে পড়ল। সেইখানেই ঘুমিয়ে রাত কাটাল। পরের দিন সকালে আর উঠতে পারে না। হাত পা ভারি পাথর হয়ে উঠেছে। কিন্তু উঠতে ত হবেই। পকেটে একটা পয়সাও নেই, ক্ষুধাতে পেট কামড়াচ্ছে! সেই কাল সকালে যা সামান্য কিছু খেয়েছে—প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেছে তারপর। অতি কষ্টে উঠে আবার চলতে শুরু করলে। প্রথমেই যে গ্রাম পড়ল সেখানে একটা চাষির বাড়ি গিয়ে জানাল, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, আমায় খেতে দেবে কিছু?

ঐ বেশভূষা দেখে প্রথমটা তাদেরও সন্দেহ হয়েছিল। চোর নয়ত? জিজ্ঞেস করলে, 'কোথায় যাবে? কোথা থেকে আসছ?' জ্যাক্ বলল, 'জাহাজে চাকরি করব। বন্দরের দিকে চলেছি। আমার সব পয়সা হারিয়ে গেছে ভাই।'

'জামা কাপড়ের এ হাল কেন তোমার?'

'পা পিছলে নদীর ধারে পড়ে গেছলুম যে।'

তাদের দয়া হল। খেতে দিল চা আর রুটি আর একটু পনির। খেয়ে যেন বাঁচল। তারপর বন্দরের সোজা পথটা জেনে নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলে। বন্দরের কথাটা হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেছিল—এখন ভাবল সে মন্দ কি! এদেশ ছেড়ে পালাতে গেলে জাহাজে চাকরি নেওয়া ছাড়া উপায় কি?

ওর সৌভাগ্য ক্রমে জাহাজ ঘাটায় যখন পৌঁছল তখন একটা জাহাজ ছাড়ে ছাড়ে। জ্যাক্ গিয়ে কাপ্তেনের হাতে পায়ে ধরল, 'আমাকে আপনার জাহাজে নিন, শুধু পেটভাতায় কাজ করব। যা বলবেন সব করব। এক পয়সা মাইনে চাইনে আমার।' কাপ্তেনের লোকের দরকারও ছিল, তিনি খুশি হয়ে ওকে কাজ দিলেন।

দীর্ঘ দিন পরে জাহাজ যখন অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছল তখন জ্যাক্ নেমে গেল। কাপ্তেন ওর কাজে খুশি হয়েছিলেন—তিনি ওকে কটা টাকা দিলেন বকশিশ আর এক পুরানো বন্ধুর কাছে চিঠি লিখে দিলেন—ওর চাকরির জন্য।

জ্যাকের ভাগ্য ফিরল এবার।

চাকরি থেকে টাকা জমিয়ে ব্যবসা, সেখান থেকে টাকা জমিয়ে চাষবাস, ক্ষেতখামার। দেখতে দেখতে বছর কুড়ি বাইশের মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা জমিয়ে ফেলল সে। এক পশমের ব্যবসাতেই তার কত লক্ষ টাকা বছরে আয়।



আরও কয়েক বছর পরে, বুড়ো বয়সে ইচ্ছা হল দেশে ফিরবেন। খোঁজ নিয়ে জানলেন ওদের দেশে যে জমিদার বাড়ি তিনি কাজ করতেন তাদের অবস্থা এখন খুব পড়ে গেছে—সেই জমিদার বাড়ি বিক্রি হবে। জমি জমা মায় বাড়িটা সুদ্ধ। লোক পাঠিয়ে সেটা কিনে নিলেন তিনি। তারপর কাজ কারবার গুটিয়ে একদিন দেশের ছেলে দেশে ফিরে এলেন। যে বাড়িতে চাকরের কাজ করতেন, সেই বাড়িতেই অসংখ্য দাসী চাকর রেখে মনিব হয়ে বসলেন।

দিন কাটে।

সুখ-সৌভাগ্য ভরা সংসার। অভাব নেই কিছুরই। তবু আংটির কথাটা ভুলতে পারলেন না। একি ভোলবার? সেদিন যেটা শোচনীয় ঘটনা বলে মনে হয়েছিল তাহতেই ত সৌভাগ্যের সূত্রপাত। আংটিটা সেদিন না হারালে হয়ত কোথাও যাওয়াই হত না—কোন দিনই উন্নতি হত না। আজও হয়ত কোথাও চাকরি করতে হত সামান্য মাইনের।

একদিন নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে সেই কথাটাই বলছিলেন এক বন্ধুকে। আরব্য উপন্যাসের মত আজব কাহিনী বর্ণনা করে নদীর ধারে একটা জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে কাদার মধ্যে হাতের লাঠিটা পুরে দিয়ে বললেন, 'এই, ঠিক এই জায়গাটাতেই আংটিটা সেদিন পড়ে গিয়েছিল। আমার আজও মনে আছে স্পষ্ট।'

বন্ধু অলসভাবে বললেন, 'অ, তাই নাকি!'

কিন্তু জ্যাক্ এমন চমকে উঠলেন কেন?

লাঠির ডগায় ও কী একটা আটকে আছে? কী ওটা? আংটি! একটা আংটি। ঠিক ত! দেখি দেখি।

জ্যাক্ তাড়াতাড়ি তুলে দেখলেন—সেই আংটিটাই, যেমন পাথর বসানো ছিল তেমনিই।

যেন ওকে সৌভাগ্যের পথে ঠেলে পাঠাতেই হারিয়েছিল, আজ প্রয়োজন মিটে গেছে বলে ফিরে এল। নইলে, ঐখানটা সেদিন ত অন্তত পাঁচশ বার হাতড়েছিলেন।.....

তোমরা ভাবছ উদ্ভট গল্প।

কিন্তু তা নয়—সত্যিই ঘটনা ঘটেছিল। জায়গাটাও বলে দিচ্ছি—স্কট্ল্যান্ড।

[ ভাদ্র, ১৩৬৭]

# ট্রেন আছে ড্রাইভার নেই

**পার্থ চট্টোপাধ্যায়**

আজগুবি নয় আজগুবি নয় সত্যিকারের কথা— ট্রেন চলছে ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্, অথচ ড্রাইভার নেই, গার্ড সাহেব নেই। সে ট্রেনের প্যাসেঞ্জার অবশ্য মানুষ নয় কতগুলি চিঠির থলি। রোজ তারা ট্রেনে চেপে যাওয়া আসা করে সাড়ে ছ'মাইল রাস্তা। মাঝখানে স্টেশনে দরকার মত থামে, আবার চলে আপন মনে ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্।

লন্ডন পোস্ট অফিসের প্রধান কর্মকেন্দ্র যেখানে, সেখানে এই ধরনের ট্রেন দেখলাম সেদিন। জায়গাটির নাম মাউন্ট প্লেসান্ট। এ জায়গার একটা বেশ মজার ইতিহাস আছে, সে কথা পরে বলছি।

এই দপ্তরের মাটির নিচে পাতা আছে সাড়ে ছমাইল লম্বা এক রেল লাইন। ৪০টি ট্রেন যাতায়াত করে ৪১,০০০ চিঠির থলি নিয়ে এক স্টেশন থেকে আর এক স্টেশনে।

এই ক্ষুদে রেল পথটিতে মোট ৮টি স্টেশন আছে। প্রত্যেক স্টেশনে আছে দুটো করে প্লাটফর্ম। একটি হল সব স্টেশনে থামে এমন ট্রেনের জন্য, অপরটি হল সব স্টেশনে থামে না এমন ট্রেনের জন্য। ট্রেনগুলি চলে ইলেকট্রিকে। একটি ঘরে বসে বোতাম টিপে ট্রেনগুলিকে চালান হয়। এক একটি ট্রেনে থাকে দুটো থেকে তিনটে করে বগি। ওপরের বাছাই অফিস থেকে চিঠির থলি ইলেকট্রিক সিঁড়ি দিয়ে আপনা আপনি নেমে আসে স্টেশনের প্লাটফর্মে। প্লাটফর্মে থাকেন পোস্ট অফিসের কর্মী। ট্রেন এলেই সে বোতাম টেপে। ট্রেন থামতেই থলি নামিয়ে নেয় আর নতুন থলি বোঝাই করে দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপর আবার বোতাম টিপতেই ট্রেন চলে ঝিক্ ঝিক্ করে পরের স্টেশনের উদ্দেশ্যে।

পৃথিবীর মধ্যে এমন ব্যবস্থা আছে একমাত্র লন্ডনেই। এই ব্যবস্থার দরুন তাড়াতাড়ি এক স্টেশন থেকে আর এক স্টেশনে জরুরী চিঠি পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়।

লন্ডন পোস্ট অফিসের অসংখ্য মোটর ভ্যানও আছে। কিন্তু লন্ডনের রাস্তাঘাট সব সময় এমন ভিড় থাকে যে, মোটর ভ্যান অনেক সময় তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারে না, আর শীতকালে লন্ডনে অধিকাংশ সময় বিশ্রী কুয়াশা পড়ে। রাস্তাঘাটে কিছু দেখা যায় না। যানবাহন সমস্ত বন্ধ থাকে; অথচ জরুরী চিঠিতো বন্ধ থাকতে পারে না। এই ট্রেনগুলির সাহায্য তখন অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

লন্ডনের পোস্ট অফিস ইউরোপের সমস্ত পোস্ট অফিসের চেয়ে বড়। প্রতিদিন লন্ডনের এক লক্ষ ডাক বাক্সে আট লক্ষ পার্সেল ও ২৬০ লক্ষ চিঠি জমা পড়ে। এই চিঠিগুলিকে যদি একটির মাথায় একটি এমনভাবে সাজিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তা লম্বায় এভারেস্টের চেয়ে চারগুণ উঁচু হবে।

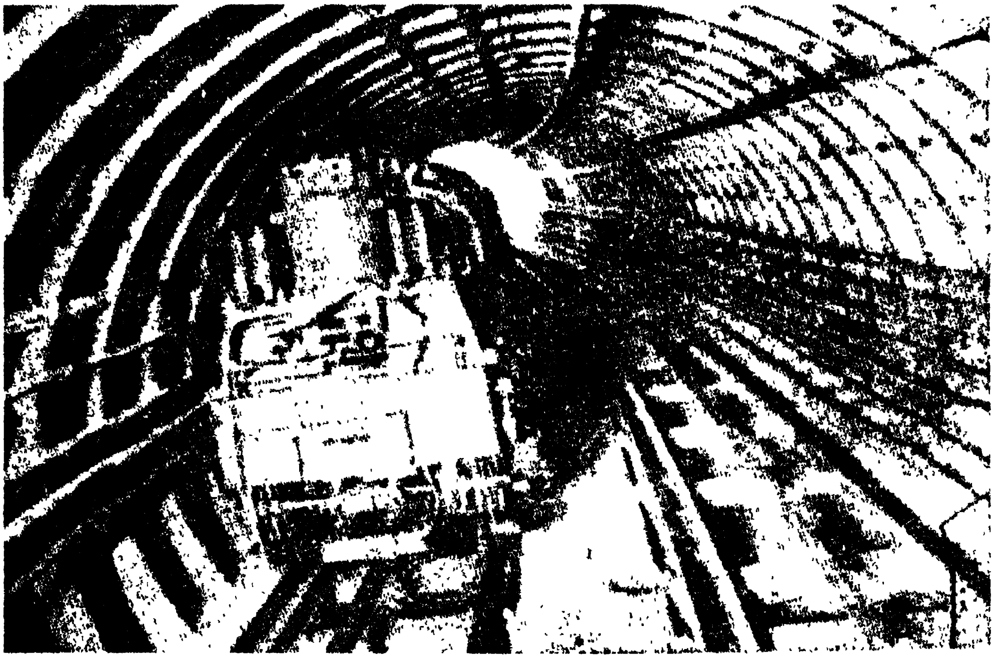
তুমি মাত্র তিন পেনি খরচ করে লন্ডন শহরের যে কোন চিঠির বাক্সে যেই একটা চিঠি ফেললে, অমনি আধ ঘণ্টার মধ্যেই পোস্টম্যান এসে সেগুলি ভ্যানে করে নিয়ে গেল বাছাই অফিসে। বাছাই অফিসে চিঠি আর বিভিন্ন প্যাকেটগুলিকে আলাদা করা হয়। সমস্ত চিঠির মুখ একসঙ্গে করা হয়, তারপর মেসিনের সাহায্যে অতি দ্রুত পোস্ট অফিসের ছাপ মারা হয়।

এরপর হল বাছাইয়ের কাজ। প্রত্যেক কর্মচারীর সামনে আছে এক একটি বিরাট বাক্স, তাতে আছে ছোট ছোট খোপ। সাধারণতঃ ৪৮টি খোপ থাকে, এক একটি বাক্সে। তুমি যে শহরে চিঠি লিখেছ, সেই শহর ও আরও অনেক শহর নিয়ে একটি খোপ আছে। সেই খোপে তোমার চিঠি রাখা হবে। তারপর আবার সেই এক একটি খোপ থেকে নির্দিষ্ট জেলার জন্য চিঠি আলাদা করে রাখা হবে। তারপর কোন কোন শহরে চিঠি যাবে, তা ভাগ করা হয়ে গেলে বান্ডিল বেঁধে ট্রেনে, জাহাজে অথবা প্লেনে চিঠি পাঠান হবে। গ্রেট বৃটেনের পোস্ট অফিস বিভাগ বছরে ট্রেন, প্লেন ও জাহাজ ভাড়াই দেয় ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা।

লন্ডনের মাউন্ট প্লেসান্টে হল জেনারেল পোস্ট অফিস। ওখানেই হল সমস্ত চিঠির আড়ৎ।

লন্ডনের মাউন্ট প্লেসান্টে এখন অসংখ্য গাড়ি-ঘোড়ার ভিড় থাকলেও একশ বছর আগে এ জায়গাটিতে একটি সুন্দর ও বিরাট খেলার মাঠ ছিল। এখন যে জায়গাটিতে পোস্ট অফিসের বিরাট প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে, ওই বাড়িটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে অপরাধীদের এক জেলখানা ছিল। ১৮৮৭ সালে পোস্ট অফিস কর্তৃপক্ষ বাড়িটি কিনে নেন।

আজ মাউন্ট প্লেসান্ট পোস্ট অফিসের বিভিন্ন দপ্তরে ৬৪০০ জন কর্মী কাজ করেন। ওপরে পদস্থ কর্মচারীদের অফিস, নীচের সমস্তটা জুড়ে বাছাই ঘর।



এই পোস্ট অফিস থেকে প্রতিদিন ১৪,০০০ চিঠির থলি বিভিন্ন স্থানে যায়। সারা দিন-রাত ধরে এই দপ্তরে কাজ চলে আর প্রতি পাঁচমিনিট অন্তর ভ্যান বোঝাই করে এখান থেকে বাছাই করা চিঠি নির্দিষ্ট স্থানে চলে যায়।

বৃটেনে খ্রীস্টমাসের সময় অসংখ্য চিঠি বিলি হয়। ঠিক আমাদের দেশে বিজয়া দশমীর মত। প্রতিটি লোক তার পরিচিত বন্ধু, আত্মীয়দের খ্রীস্টমাসের শুভেচ্ছা জানিয়ে চিঠি লেখে। হাজার হাজার লোক উপহার পাঠায়। ঐ সময় এই পোস্ট অফিসে দৈনিক ৪০ লক্ষ চিঠি ও ১ লক্ষ প্যাকেট আর ১৮ লক্ষের মত পার্সেল আসে।

পোস্ট অফিসের কর্মীরা চেষ্টা করেন অতি দ্রুত চিঠি পৌঁছে দেবার জন্য, কিন্তু যে সব চিঠিতে ঠিক মত ঠিকানা লেখা থাকে না, সেগুলি নিয়ে বিপদ। শুনে অবাক হবে সারা বৃটেনে দৈনিক যে সব চিঠি পোস্ট করা হয় তার মধ্যে ৮০ লক্ষ চিঠির ঠিকানা ঠিক মত লেখা থাকে না। বাছাই অফিসে বিভিন্ন দপ্তর আছে এই সব চিঠির গতি করার জন্য। যে সব চিঠির বাড়ির নম্বর দেওয়া নেই, গ্রাম বা পোস্ট অফিস দেওয়া নেই, বা যে চিঠির প্রদেশের নাম দেওয়া নেই, সেগুলি সব আলাদা আলাদা করে রাখা হয়। একটি মজার দপ্তর আছে, যে সব চিঠিতে কিছুই লেখা থাকে না তাদের জন্য। কর্তৃপক্ষ একটা চিঠি দেখালেন, তাতে খামের ওপর লেখা আছে "ফাদার খ্রীস্টমাস্" আর কিচ্ছু নয়।

ফাদার খ্রীস্টমাসের কাছে চিঠি পৌঁছে দেওয়া আর যাই হোক পোস্ট অফিসের পিওনের কর্ম নয়—কিন্তু যে লিখেছে সেকি আর তা বুঝবে!

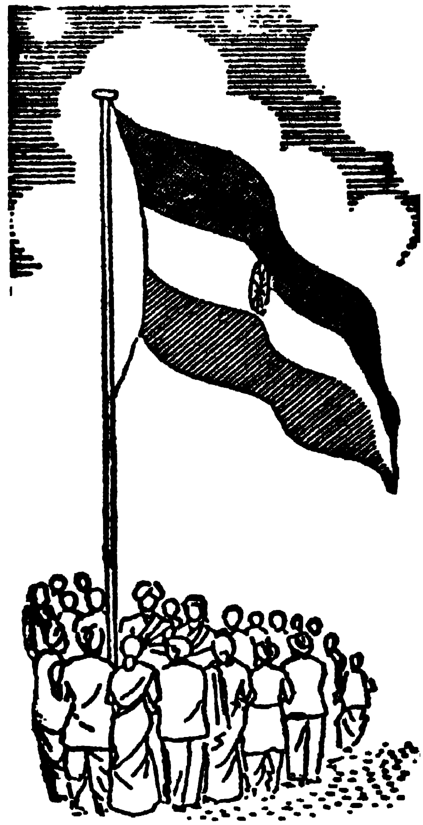


[ ভাদ্র, ১৩৬৭ ]

নির্বাচিত রোশনাই

# পনরই আগস্ট

## রবীন্দ্রনাথ সরকার



জাতীয় জীবনে একেকটি দিনের গুরুত্ব অপরিসীম, আমরা কাব্য করে বলি 'স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার দিন।' পনরই আগস্ট এমনি এক দিন— ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে এই দিনে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে। এবারের পনরই আগস্ট তারিখে তাহলে স্বাধীনতার তের বছর পূর্ণ হল।

১৯৪৭ সনের আগস্টে দেশের স্বাধীনতা লাভ করার অর্থ, তার আগে দেশ পরাধীন ছিল। সে পরাধীনতার ইতিহাস তোমাদের সকলেরই কমবেশী জানা। ভারতের জাতীয় জীবনের সেই অধ্যায় কলঙ্ক, গ্লানি ও অমর্যাদার। একটি অধিকতর শক্তিশালী দেশ যখন আরেক দেশের উপর হামলা চালায়, তাদের স্বাধীনতা রক্ষার আপ্রাণ প্রতিরোধ ভেঙ্গে ফেলে দেশ ও শাসনশক্তি দখল করে নেয়, তার মধ্যে অমর্যাদার বেদনা থাকলেও কলঙ্ক থাকে না, গ্লানি থাকে না। কিন্তু ইংরেজের এদেশ দখলের কাহিনী তেমন সোজাসুজি সংগ্রামের কাহিনী নয়। তার মধ্যে ওপক্ষে যেমন শঠতা প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র আছে, এপক্ষেও তেমনি আছে আত্মকলহ বিচ্ছিন্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতা। তাই সেদিনের বিচ্ছিন্ন ভাবতে স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টায় এককভাবে অনেকের সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গ মহনীয় হলেও, সমগ্রভাবে জাতীয় চরিত্র জাতির ইতিহাসকেই কলঙ্কিত করেছে।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধজয়ে ভারতে ইংরেজ রাজত্বের পত্তন; ১৮৫৭ সনের সিপাহী বিদ্রোহ ভারতের প্রথম স্বাধীনতার লড়াই বলে কথিত। এই বিদ্রোহেও আগেকার দিনের সব দুর্বলতা প্রকট,—সেই অনৈক্য, অসহযোগিতা, আত্মপরায়ণতা ও একনেতৃত্বে আস্থার অভাব। তারপর ধীরে ধীরে অবস্থা বদলেছে, সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধ, সেই সঙ্গে ঐক্যবোধ জেগে উঠেছে। ইংরেজের বিরুদ্ধে একজন রাজা মহারাজা বা নবাব বাহাদুরের ব্যক্তিগত আক্রোশের স্থলে সার্বজনীন জাতীয়তাবাদের উদ্বোধন ঘটেছে। আর পরাধীন দেশে জাতীয়তাবাদের জাগরণ অর্থই জনসাধারণের বিপ্লবী সংগ্রাম। সেই বিপ্লবে ক্রমশ বেগ সঞ্চারিত হয়েছে। কত দুঃখ পীড়ন নিষ্পেষণের বাধা, কত ত্যাগ, সঙ্কল্প আর শহিদদের আত্মবলিদানের গৌরবময় প্রেরণা! সেই প্রেরণার জয় ঘটেছে ১৯৪৭ এর পনরই আগস্ট।

এখানে এই বিগত দু'শ বছরের ইতিহাস লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। তোমরা যারা কিশোর তরুণ, তারা ক্রমে ক্রমে সে ইতিহাস পড়বে, কোথায় আমাদের জাতীয় দুর্বলতা তা আবিষ্কার করে দূর করবে, আর কোথায় শক্তি তাও জেনে তাকে আরও সংহত ও দৃঢ় করে তুলবে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামেও দুর্বলতা ছিল বৈকি, না হলে এক স্বাধীনতা রক্তধারায় সীমাঙ্কিত হয়ে দুই স্বাধীনতা হয়ে দেখা দিত না, দেশ ভাগ হয়ে লক্ষ লক্ষ নিরীহ নির্বিরোধ মানুষের আর্ত কান্নায় দেশের আকাশ আজও ভারী হয়ে থাকত না!

আজ সে কথা থাক। বলছিলাম পনরই আগস্টের কথা, স্বাধীনতা দিবসের কথা। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা বলতে সত্যি কী বুঝি আমরা? দেশ বলতে কি বুঝি সাগর-পর্বত বেষ্টিত দেশের ভূমি? আর দেশের ভূমিই যদি দেশ হয় তবে সেই ভূমির স্বাধীনতার অর্থ কী? একটি কাল্পনিক উদাহরণ নেওয়া যাক। ধরা যাক ভারতমহাসাগরের বুকে এক বৃহৎ দ্বীপ—নানা অরণ্য সম্পদে খনিজে সে দ্বীপ সমৃদ্ধ। নানা শ্রেণীর প্রাণীও আছে দ্বীপের অরণ্যে,

কিন্তু মানুষের বাস নেই সেখানে। কল্পনা করা যাক মহাসাগরের তীরবর্তী কোন দেশের মানুষ জাহাজে করে সেই দ্বীপে গিয়ে নামল, অরণ্য কেটে জনপদ বসাল, পত্তন করল নতুন এক রাজ্যাংশের। সেই দ্বীপটি কি পরাধীন হল?

সহজ বুদ্ধিতে তোমরা বলবে, তা কি করে হবে, দ্বীপে তো আর মানুষ ছিল না! সত্য কথা। দ্বীপের ভূমি, তার উপরের নিচের সম্পদ অপ্রয়োজনে পড়ে ছিল, তা যদি কারও প্রয়োজনে লাগে সেতো মানুষেরই লাভ। কিন্তু ঐ দ্বীপে মানুষের বাস থাকলে এক্ষেত্রে অবস্থা উল্টো হয়ে দাঁড়াত, আমরা বলতাম দ্বীপদেশটি পরাধীন হল, ঐ মহাদেশীয় জাতিটি ওদের স্বাধীনতা হরণ করল। তাহলে কথাটা দাঁড়াল এই যে আমরা যখন দেশের স্বাধীনতা পরাধীনতার কথা বলি, জানি লোকে বুঝবে দেশের অধিবাসী মানুষের কথাই বলছি। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে দেশের ভূমি ও মানুষ দুয়ে মিলেই দেশের অখণ্ড সত্তা। দেশহীন মানুষের (যেমন যাযাবর বেদে, জিপসি, বেদুইন প্রভৃতি) স্বাধীনতা যেমন অফলপ্রসূ, পরাধীনতাও তেমনি অবাস্তব, কারণ ওদের যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা হরণ করে কারও কোন লাভ নেই, যদি না ওরা তাদের ক্ষতির উদ্দেশ্যেই ঘুরে বেড়ায়।

এবার তোমাদের সামনে আরও একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরা যাক। পরাধীনতাকে আমরা বলি অভিশাপ স্বাধীনতা সকলেরই কাম্য। কিন্তু কেন? সেকালে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হত। বিদেশী রাজা কোন রাজ্য আক্রমণ করলে সেখানকার রাজাও দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতেন, প্রজারাও অনেক ক্ষেত্রে সহযোগিতা করত। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজারা ইতিহাসে দেশপ্রেমিক বলে কীর্তিত হয়ে আসছেন, তাঁদের ত্যাগের পরিমাণানুসারে তাঁরা আজও সকল মানুষের পূজা পান। কিন্তু এমনতো বহু ক্ষেত্রেই হওয়া সম্ভব যে আক্রান্ত দেশের রাজা ছিলেন অদক্ষ শাসক, প্রজাপীড়ক, বিলাসী, অমিতাচারী ইত্যাদি; আর আক্রমণকারী সকল দিক দিয়েই ছিলেন তুলনায় শ্রেষ্ঠ। তাই বলে বিদেশী বা বিজাতীয় মহান দিগ্বিজয়ীকে বিশ্বাসঘাতক ছাড়া কেউ অভ্যর্থনা করে নেয়নি।

একালে অধিকাংশ দেশ থেকে রাজা মহারাজাদের উচ্ছেদ হয়েছে, সর্বত্রই প্রচলিত হয়েছে গণতান্ত্রিক শাসন। যে দু'চারটি দেশে আজও রাজা আছেন সেখানেও শাসন ব্যাপারে প্রজার অধিকার স্বীকৃত। এই গণশাসিত যুগেও যে সব রাষ্ট্র অন্য দেশের উপর হামলা করে বা দখল বজায় রাখে তাদের বলি আমরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। নিঃসন্দেহে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি অধিকৃত দেশের চেয়ে উন্নততর,—তারা শাসনদক্ষ, শিল্প বাণিজ্যে প্রাগ্রসর, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান তাদের করায়ত্ত। তথাপি অনুন্নত দেশগুলি তাদের অধীনে থাকতে অস্বীকৃত কেন? অনেক মৃত্যুপণ করেও কেন তারা স্বাধীনতা লাভে সচেষ্ট?

এর জবাব অতি সহজ। সেকালের রাজাবাদশাই হোক বা একালের সাম্রাজ্যবাদী দেশই হোক—যারাই পররাজ্য আক্রমণ করে তাদের উদ্দেশ্য লুণ্ঠন; আর সে রাজ্য দখল করে রাখলে তার উদ্দেশ্য শোষণ। দিগ্বিজয়ী রাজাবাদশাদের পররাজ্য লুণ্ঠনের অনেক নির্মম ইতিহাস তোমরা পড়েছ। একালের ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, স্পেনীয়, পর্তুগীজ প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি কি হিংস্র নির্মমতায় অধিকৃত দেশগুলির সম্পদ শোষণ করে তাদের পাংশু করে ফেলেছে, আজও ফেলছে- সে ইতিহাসও কিছু কিছু নিশ্চয় পড়েছ। অতীতের আক্রমণকারীরা মানুষ মেরে কেটে, নগর জনপদ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শ্মশান করে সোনা রুপা ধনরত্ন লুট করে নিত। সে উৎপীড়ন চলত সোজা রাস্তায়। এযুগের বর্বরতাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ভদ্রবেশী। অগ্রসর শিল্পশক্তির প্যাঁচে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কূট কৌশলে এবং আরও বহুবিধ ছলনার আশ্রয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি অধিকৃত, এমন কি অনধিকৃত দেশেরও সম্পদ শোষণ করে চলেছে। বাধা পেলেই তাদের ভদ্রতার মুখোস খসে পড়ে, বর্বরতা প্রকাশ্য রূপ নেয়।

ফলে এই সব অনগ্রসর দেশগুলির অজস্র সম্পদ স্বদেশের মানুষের প্রয়োজনে লাগে না, সাত ভূতে লুটে খায়। অন্ত থাকে না তাদের দুঃখ দুর্দশার। তাই প্রয়োজন স্বাধীনতার। স্বাধীনতা নিজের ভাগ্য নিজে নিয়ন্ত্রণের অধিকার। সেই যে নির্দিষ্ট সীমা-চিহ্নিত ভূমি আর তার মানুষ মিলে দেশের অখণ্ড সত্তা, তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ স্বাধীনতার লক্ষ্য। দেশের বা জাতির এই সর্বাঙ্গীণ বিকাশ কী বস্তু?

এই বিকাশের একদিকে দেশের বৈষয়িক অগ্রগতি—শিল্প বাণিজ্য ও কৃষির প্রসার, যোগাযোগ ও যাতায়াত তন্ত্রের উন্নতি এবং আরও হাজারো অনুরূপ ব্যবস্থা। এসবের মারফত হবে মানুষের দারিদ্রমোচন, কর্মসংস্থান, অন্নবস্ত্র ও বাসগৃহের সমস্যার সুরাহা। আধুনিক বিজ্ঞানের দেওয়া নানা কল্যাণকর উপকরণ মানুষের হাতে তুলে দিয়ে তাদের জীবন নীরোগ স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর করে তোলাই জাতির বৈষয়িক অগ্রগতির লক্ষ্য। জাতীয় প্রগতির আরেক দিকে মানসিক বিকাশ। মানুষের বাঁচাতো শুধু খাওয়াপরাতে আর দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যে নয়। তার দেহের ক্ষুধা

যেমন সত্য, তেমনি তার মনের ক্ষুধা। এই ক্ষুধা মেটাবার জন্য তার শিক্ষাদীক্ষা জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা। জাতির ভাষাসাহিত্য শিল্পকলা সঙ্গীত নৃত্যের মধ্যে তার চিৎপ্রকর্ষ ভাস্বর হয়ে ওঠে। কালাগত সংস্কৃতির ধারা জীবন-যাপনের নিজস্ব রীতি—জাতির বিশিষ্ট প্রতিভার পূর্ণ বিকাশে এদের পরিপূর্ণতা। সহজেই বুঝা যায় জাতির বৈষয়িক ও মানসিক বিকাশ একে অন্যের পরিপূরক, একটি ছাড়া আরেকটি অর্থহীন। স্বাধীনতা এই উভয় বিকাশের প্রতিশ্রুতি।

সেই স্বাধীনতা এসেছে ১৯৪৭ সনের পনরই আগস্ট তারিখে। কিন্তু স্বাধীনতার সংগ্রামে যারা যোগ দিয়েছিল তারা কি চেয়েছিল নিজেরা সুখী হতে? তা নয়। তারা যখন দুঃখ বা মৃত্যু বরণ করেছে তারা চেয়েছে দেশের সকল মানুষ, তাদের উত্তর পুরুষ পুরোপুরি বাঁচবে, জীবনকে উপভোগ করবে, সুখী হবে দেশের সকল মানুষ, সমাজের একাংশ নয়। স্বাধীনতার ফসলে প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকার। অন্ন বস্ত্র কর্ম বাসস্থান সব পাবে তারা, পাবে সন্তান সন্ততিকে যথোপযুক্ত শিক্ষাদানের সুযোগ, ভোগ করবে অবসর বিনোদনের জন্য সাহিত্য সঙ্গীত শিল্পের সেরা দান; এক কথায় প্রতিটি নাগরিকের জীবন-যাত্রার মান দিনে দিনে উন্নততর হবে। তা যদি না হয়, দেশের বর্ধমান সম্পদ যদি সমাজের একাংশের হাতে জমে আর তার বৃহত্তম অংশ আরও ক্লিষ্ট, আরও শীর্ণ হয়, তাহলে স্বাধীনতা হবে নিষ্ফল, শহিদের আত্মদান হবে ব্যর্থ। এমন যদি হয় তবে তার পাপ যেমন দেশের মানুষের, সেই পাপমুক্তির দায়িত্বও দেশের মানুষের। যে-বিপ্লব বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে, সেই বিপ্লবই স্বদেশী পুঁজিবাদের হাত থেকেও মানুষের অধিকার ছিনিয়ে আনে। একে গণতন্ত্র সমাজবাদ সাম্যবাদ যা খুশী বল, তাতে কিছু যায় আসে না। নিঃসন্দেহে এই অধিকারই স্বাধীনতা—আর তোমরা দেশের তরুণ তরুণী, কিশোর কিশোরী সেই স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী। পনরই আগস্ট তাই যেমন উৎসবের দিন, আনন্দের দিন, তেমনি সঙ্কল্পের দিন প্রতিজ্ঞারও দিন—স্বাধীনতা যেন ব্যর্থ না হয়।

[ ভাদ্র, ১৩৬৭]



# লেবুটেবু সবই আছে

কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

এক বিদেশী পথিক। হেঁটে হেঁটে কুটুম্ববাড়ি যাচ্ছিল সে। যেতে যেতে পথেই সন্ধ্যা উৎরে গেল। অচেনা জায়গায় রাত চলার উপায় নেই, সাম্‌নে এক গৃহস্থবাড়ি দেখে সেখানে গিয়ে সে বলল—'আমি বিদেশী মানুষ, অন্ধকারে পথঘাট চিনে যেতে পারছিনে। রাতটা কাটাবার জন্য আমাকে একটু থাকার জায়গা দিন।'

লোকটিকে গৃহস্থ বাড়িতে থাকার জায়গা দিল।

অতিথি হাতমুখ ধুয়ে এসে ঠিকঠাক হয়ে বস্‌ল। তারপর গৃহস্থকে বল্‌ল—'বাবু, রাতটা কাটাবার উপায় হলো, এবার নিশ্চিন্ত হলুম। আমার খাওয়াদাওয়ার জন্য অবশ্য কোন চিন্তা নেই। আমার সঙ্গে লেবুটেবু সবই আছে। শুধু একটা আল্‌গা উনুন পেলেই হয়, আমার স্বপাকেই খাওয়ার অভ্যাস কিনা।'

—'সে আর বেশী কি! —বলে গৃহস্থ একখানা আলগা উনুন নিয়ে এল।

অতিথি বল্‌ল—'বেশ বেশ, এতেই কাজ হবে।' তারপর দু-একবার গলা খাঁকারি দিয়ে বলে উঠ্‌ল—'বাবা, অভয় দেন তো একটা কথা বলি।'

—'বলুন্ যা বল্‌তে চান স্বচ্ছন্দে বলুন'—গৃহস্থ এই বলে তাকে ভরসা দিতেই সে ইয়ে-ইয়ে করে বল্‌ল—'একটা হাড়ি আর কিছু লক্‌ড়ি পেলেই এবার রান্নার জোগাড় করা যায়।'



গৃহস্থ তক্ষুণি একটা বোক্‌না আর এক বোঝা কাঠ নিয়ে এলো। কিন্তু খালি বোক্‌না তো আর উনুনে চড়ানো চলে না, তাই জলও আনল ভরে।

হেঁ-হেঁ করে উঠে অতিথি বল্‌ল—'আপনি বুদ্ধিমান লোক। জলও নিয়ে এসেছেন হাঁড়িব সাথে। জলের কথা আমি বল্‌ব ভেবেছিলুম। আপনি পেটের কথা টেনে নিয়ে আগেই সব করে দেন দেখ্‌ছি। তবে...দেখুন, কিছু মনে না করেন তো, আর একটা নিবেদন জানাই। হাঁড়িতে জলটা অনর্থক ফুটবে কেন? ওর সঙ্গে দুটো ডাল ছেড়ে দিলে একসঙ্গেই কাজ হয়ে যাবে। ডাল বলতে আমি বুঝি সোনামুগের ডাল—গলবে সহজেই। দুমুঠো সোনামুগের ডাল যদি পাই তাহলে রান্নার ব্যাপার আমিই করে নিতে পারব। আমার খাওয়ার জন্য আপনাদের আর কোনো কষ্ট দিতে চাইনে। লেবুটেবু সবই আমার আছে।'

অতিথির রান্নার জন্য সোনামুগের ডাল তক্ষুণি এসে গেল। উনুনে হাঁড়ি চড়িয়ে তার মধ্যে ডালটা ছেড়ে

দিতে দিতে অতিথি বল্‌ল—'আপনাদের আর জ্বালাতে চাইনে। দিব্যি খিচুড়ি এতেই হবে, আর তাতেই আমার চলে যাবে—একবেলার তো কথা! তবে,—বলছি কি,— মাথা চুলকোতে চুলকোতে সে আবার বল্‌ল—'চারটি বাসমতি চাল পেলেই খিচুড়িটা হতে পারে, নইলে শুধু ডালে তো আর তা হয় না। অবশ্য, লেবুটেবু আমার সবই আছে চালটারই যা অভাব!'

অতিথির ফরমাস বুঝে গৃহস্থ চাল নিয়ে এসে হাঁড়িতে ঢেলে দিল।

দেখে অতিথি বলল—'হ্যাঁ হ্যাঁ, এইবার খাসা খিচুড়ি রান্না হয়ে যাবে। আপনি মহাশয় ব্যক্তি, আপনাকে বেশী কিছু বলা সাজে না। তবে অতিথি সেবায় আপনার দরাজ প্রাণ, তাই জানিয়ে রাখ্‌ছি—হাঁড়িটার মধ্যে গোটা কয়েক আলু বেগুন দিয়ে রাখলে তা-ও সেদ্ধ হয়ে থাকবে। তা হলে খিচুড়ির সঙ্গে দুটো তরকারীর টুকরোও মুখে পড়তে পারে। এর বেশী হ্যাঙ্গামের আর দরকারই-বা কি! পেট তো একটা, আর তাতে কিছু দেওয়া, তার উপর একটা রাতের ব্যাপার, নইলে লেবুটেবু সবই তো আমার আছে।'

গৃহস্থ অতিথিব ফাইফরমাস বুঝে একে একে সবই এনে দিল! তার কাছে লেবুটেবু সবই আছে—একথার মর্মার্থ আগেই সে বুঝতে পেবেছিল। আলুবেগুনেব কথা শুনে সে নিয়ে এলো আরো দু চারটে আনাজেব সঙ্গে খিচুড়ি রান্নাব ঘি-মশলাও। শেষ পাতে দেওয়ার জন্য একবাটি দই আর কিছু মিষ্টিও।

খেতে বসার আগে অতিথি তাব ঝোলার ভেতর থেকে একটা লেবু বের করে গৃহস্থের চোখের সামনে ধরে বল্‌ল—'এই দেখুন মশাই, আমি মিথ্যা বলার লোক নই, লেবুটেবু আমার সত্যিই আছে কিনা, স্বচক্ষেই দেখুন। লেবুটা কেটে দেওয়ার ব্যবস্থা হলেই খেতে বসে যাওয়া যেতে পারে।'

গৃহস্থ এতক্ষণ হাসি চেপে রেখে বগড় দেখ্‌ছিল। এবার তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে হাসতে হাসতে জবাব দিল—'থাক্ থাক্ আমার ঘর থেকেই আপনাকে লেবু এনে দিচ্ছি। আপনার ও লেবু আর খরচ করার দরকার নেই। কাল কোথাও রাত কাটাতে হলে তখন তো ওটা আবাব আপনার কাজে লাগানো চাই।'

[ আশ্বিন, ১৩৬৭]



## ॥ শরতের কবিতা ॥

গোবিন্দ প্রসাদ বসু

নরম সোনালী রোদ ঝরে ঝুর্ ঝুর্,
কাশবনে রুন্-ঝুন্ হাওয়ার নূপুর!
দীঘিটার আয়নায় আকাশের নীল,
ঘাসে ফুলে শিশিরের হীরে ঝিল্‌মিল্!
রঙ্-পাখা প্রজাপতি নাচে আঙিনায়,
পদ্মের বনে বনে মৌমাছি গায়।
চারদিক ভুর্-ভুর্ শিউলির বাস,
শরতের চিঠি নিয়ে হাস্‌ছে আকাশ!
বাউলের হাতে বাজে মিঠে একতারা—
প্রাণে প্রাণে আজ তাই মেতে ওঠে পাড়া।।

[ ভাদ্র, ১৩৬৭]

## ॥ চোখের জল ॥

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চোখের জল সমুদ্দুর
আমরা যাবো অনেক দূর;
হিমসাগর, চোখের জল, তুষার গ'লেছে
কোথায় যেন আঁধার ঘরে মুক্তা ফ'লেছে—
আমরা যাবো অনেকদূর
দুঃখ আজ সমুদ্দুর!

ঘুমতাড়ানী বাদলরে
মাদল বাজা খুব জোরে;
চোখের জল, সাত সাগর, নাচতে লেগেছে
কোথায় যেন সাপের মাথায় মানিক জেগেছে—
আমরা যাবো অনেক দূর,
স্বপ্ন আজ সমুদ্দুর!

[ আশ্বিন, ১৩৬৭ ]

# সবুজ দেশের আলো

(একাঙ্কিকা)

রমেন দাস

।। প্রথম দৃশ্য ।।

(আবছা অন্ধকারে ভরা একটি ঘর। ঘরের এক ধারে বিছানায় শুয়ে আছে একটি কিশোর। নামও তার কিশোর গভীর নিদ্রার কোলে নিজেকে হারিয়ে ফেলে তখন সে স্বপ্ন বিভোর। এমন সময় কিম্ভূতকিমাকার একটি মূর্তি নাচ্‌তে নাচ্‌তে প্রবেশ করলো সেই ঘরে।)

মূর্তি ।। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ,হিঃ—হিঃ---হিঃ- --হিঃ
তোমরা চিনবে আমায় কি?
আমি নিজে হাসি, কাঁদাই সবে,
রাবণ রাজার ঝি
আমি কিম্ভূতকিমাকাব—
আমি ধারিনা কাহাবো ধার,
আমি আপন খুশিতে নাচি আর খেলি,
হেসে মবি হিঃ হিঃ হিঃ—
আমি বাবণ রাজার ঝি।
(নাচতে নাচতে ও গাইতে গাইতে অদ্ভুত ভঙ্গিমায প্রস্থান)।
কিশোরের ঘুমে যেন একটু ব্যাঘাত হলো। একটু উঠে বসে শঙ্কিতভাবে চোখ রগড়ালো। তারপর আবার গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। এমন সময় অদৃশ্য থেকে এক পরীর কণ্ঠ ভেসে এলো)।

পরী ।। কিশোর, ঘুমের ঘোরে তুমি কাল অনেক প্রশ্নই করেছিলে! জানতে চেয়েছিলে, কোথায় তোমাব মা আর কোথায় তোমার প্রাণের সঙ্গী, আদরের বোন শ্যামলী! কিন্তু সব শুনতে পেয়েও আমি তার জবাব দেইনি। জবাব দেবো কি, আমরা সব পরীরদলতো কোনদিনই তোমাদের দুঃখ-কষ্টের কথা ভাবিনি। আনন্দের বানে আমরা ডুবে থাকতাম। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি কিশোর, সেইদিনের সেই গভীর রাত্রে তোমার অসহায় মার অঙ্গে যখন দস্যুদের ছুরিকাঘাত হলো, সেদিন থেকে আমাদের চোখ খুললো। সেদিনের সেই গভীর রাত্রে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে তোমার মা যখন কেঁদে কেঁদে বলে উঠেছিলো ঃ আমার কিশোরকে কি কেউ দেখবে না, আমার শ্যামলীকে কি কেউ বাঁচাবে না? সেদিন আমরা নূতন করে শপথ নিয়ে ছিলাম, মানুষের বেদনা---বিচ্ছেদ আর শোক সন্তাপের দিনে তাদের পাশে দাঁড়াবো! ...তাই...
(এবার কিশোরের ঘুম ভেঙে গেলো। অবাক দৃষ্টিতে সে চারিদিকে তাকাতে লাগলো)।

কিশোর ।। কে, কে কথা কইলে তুমি? কি, চুপ করে রইলে কেন? কে তুমি, বলো না? তুমি কি আমার মায়ের খবর এনে দেবে? বলে দেবে কি, কোথায় আমার বোন শ্যামলী? বলো, বলো, কে কথা কইছিলে? (কোন সাড়া না পেয়ে) তা হলে কি স্বপ্ন দেখছিলাম? তবে কি ... (দুহাতে চোখ-মুখ চেপে বসে খোকন গুমরে গুমরে কাঁদতে লাগলো। এমন সময় সেই কিম্ভূতকিমাকার মূর্তিটি নাচতে নাচতে আবার এসে হাজির।)

মূর্তি ।। এই খোকাটা, কি হয়েছে?
কাঁদিস যে ভেউ ভেউ—
কাঁদিস কেন অমন করে,
মটকে দেবো ঘাড়টি ধরে,
আমায় চিনিস? আমি যে সেই

সাগর পারের ফেউ!
আমি নিজে হাসি কাঁদাই সবে,
যখন সুযোগ পাই।
দুধ বলে দেই বিষের বাটি
তোর কিরে তা চাই?
আমি বিনা মেঘেই বজ্র হানি
জাগাই নদের ঢেউ!
আমায় চিনিস? আমি যে সেই
সাগর পারের ফেউ।

(প্রস্থান)

(কিশোর ভয়ে আরো সংকুচিত হয়ে পড়েছিলো। এবার অনেকটা শক্ত হয়ে নির্ভয় হলো।)

কিশোর ।। কে ? সাগব পারের ফেউ? বিনা মেঘে বজ্রপাত করে? দুধ বলে বিষের বাটি দেয়? নিজে হেসে অপরকে কাঁদায়?.. তা কাঁদাক, আমি কাঁদবো। তবুও আমার মাকে, আমার বোনকে আমি চাই-ই চাই! মা-মা! শ্যামলী? তোমরা কোথায়? আমি যে এখানে একা? কোথায় গেলে তোমরা?

(আবার অদৃশ্য থেকে পরীর কণ্ঠ)

পরী ।। আছে কিশোর। তোমাব শ্যামলী বোন আজো বেঁচে আছে! দূরে, বহুদূরে শ্যামল ছায়াঘেরা সবুজ নদীব ঐ ওপারে তোমার বোন আজো জেগে আছে। তোমায না দেখে তার বুকেও আজ তোমার মতোই ব্যথা। তাই তো শ্যামলী কাঁদে। কাঁদে আর বলে ঃ কোথায় কিশোর-ভাই, কোথায় মা আর কোথায় আমার সাধের স্বপ্ন!...

কিশোর ।। তুমি কে? কোথা থেকে, কে কথা কইছো তুমি? ভারী সুন্দর তো তোমার কথাগুলো আমায় তুমি আমার শ্যামলীর কাছে নিয়ে দেবে? এনে দেবে আমার শ্যামলীকে?

পরী ।। আমাদের তোমরা চিনবে না কিশোর। আমরা যে সব পরীরদল। নীল আকাশের গভীরে নীলে আমরা মিশে থাকি। রাত্রির অন্ধকারে যখন তোমরা ঘুমিয়ে পড়ো, যখন ক্লান্ত হয়ে সমস্ত পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়ে, তখন আমরা শিশির পড়ার শব্দের মতো ধীরে ধীরে এই পৃথিবীতে নীরবে নিভৃতে নেমে আসি। আবাব ভোরের সূর্য ওঠার আগেই মিলিয়ে যাই আকাশের গভীর নীলে।

কিশোর ।। কেন, দিনের আলোয় তোমরা নেমে আসো না কেন? আমার জীবনের এই অন্ধকারে এসে তোমরা আলো দাও। দেখছো না, আমি আজ একা? তোমরা আমার শ্যামলীকে খুঁজে দাও। এনে দাও আমার হারানো বোনকে।...

পরী ।। খোকন একটু শক্ত হও, ধৈর্য ধরো। তোমার বোনকে তুমিই খুঁজে আনতে পারবে।

কিশোর ।। পারবো? পারবো পরীদি? ফিরে পাবো কি আমার শ্যামলীকে? কবে, কখন, কোথায়—বলো বলো, পরীদি? কোন দিকে সেই পথ?

পরী ।। দূরে বহুদূরে ঐ যে সবুজ নদী, ঐ নদীর ওপারেই শ্যামলী আজ একা। তারও বুকে ভাই হারানোব বেদনা। তাই এগিয়ে যাও--- তবে সাবধান অনেক বাধা-বিপত্তি আসতে পারে—ভয় পেয়ো নাকো। অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট জয় করতে হবে।

কিশোব ।। পরীদি! যদি আমি সেখানে গিয়ে না পৌছুতে পারি তবে

পরী ।। আঃ---পারবে না কেন? চেষ্টা করলে কিই না হয়! আমরা তো আছিই। দিনে সূর্যদেব তোমায় আলো দেবে, আর আমরা যত পরীরদল রাত্রিতে অন্ধকারের আকাশে তারা হয়ে ফুটে থেকে তোমাকে পথের ইসারা দেবো। তুমি চলো—নির্ভাবনায় এগিয়ে চলো...। দেখবে, তোমার শ্যামলীকে তুমি পাবেই।

কিশোর ।। এ্যাঁ... আমি পাবো, পাবো আমার হারিয়ে যাওয়া শ্যামলীকে? (আনন্দে অধীর হয়ে) সত্যি বলছো, পাবো শ্যামলীকে? —শ্যামলী?

(কিশোর এগিয়ে চললো)

### ।। দ্বিতীয় দৃশ্য ।।

(একটি গহন বনের অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ। থম থম করছে গভীর নির্জনতা। দু'-



একটি পশুপাখির বিকট চীৎকার ছাড়া আব টু-শব্দটি নেই। পথের সমস্ত বাধা-ভয় সংশয় অতিক্রম কবতে করতে এগিয়ে চলেছে কিশোর। চোখ মুখে ফুটে উঠেছে কঠিন শপথেব ছাযা!)

কিশোর ।। আমি কি তবে পথ ভুল করে এলাম? একটা মানুষ তো দূরের কথা, কাক-পাখীটিরও দেখা নেই! কে, তুমি কে ভাই? (একটা সাঁওতালীকে দেখে)

সাঁওতালী ।। তুহি কে আছিসরে বেঠা? বাঘ-ভালুকে তুর ডর নাহি আছে? উধারে তো বাঘের বহুৎ ডর আছে। প্রাণে বাঁচবি তো উদিকে মাত যাবি।...

[কিশোর একটু ভাবিত হয়ে কি বলতে যাচ্ছিলো। কিন্তু, কোন কথা শোনার অপেক্ষা না করেই সাঁওতালীটি ব্যস্তভাবে চলে গেলো।]

কিশোর ।। বাঘের ভয় আছে? বাঘ...তবে কি...না-না-না, আমি যাবোই। আমার বোন শ্যামলীকে খুঁজতে গিয়ে যদি বাঘের পেটেও যেতে হয়, আমি যাবো। কোন বাধা, কোন ভয়ই আমি মানবো না।
(কিশোর এগিয়ে চলতে উদ্যত হলে কিম্ভূতকিমাকার সেই মূর্তিটি নৃত্যের ভঙ্গিমায় প্রবেশ করে তার পথ রোধ করে দাঁড়ালো।)

হিঃ-হিঃ-হিঃ-হিঃ—
আমি রাবণ বাজাব ঝি!
কোথায় যাচ্ছো মানুষ ছেলে,
ভাবছো অতো কি?
হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ—।

[দাঁত বার করে একগাল বিকট হাসি হেসে কিশোরের দিকে আরও একটু এগিয়ে এলো। কিশোর এবার একটু শঙ্কিত হয়ে পড়লো।]

কিশোর ।। কে, তুমি কে?

মূর্তি ।। আমি কে? হেঃ-হেঃ-হেঃ-হেঃ! তাই জানো না?
হিগডাল, বিগডাল,
হাড়গিল, গিলগিল,
আমি বাটগিলরে—
আমি বুড়ো বুড্ডী,
ভন ভন মুড্ডি,
হিল-মিল কিল-খিল,
আমি খেঁকো চিলরে!..

[আজব সুরে সুর তুলে গান গাইতে



গাইতে কিশোরের পথ রোধ করে নাচতে সুরু করলো। প্রথমে ভয় পেলেও, পরে কিশোর বাধা দিয়ে উঠলো। ]

কিশোর ।। দাও, আমার পথ ছেড়ে দাও!

মূর্তি ।। পথ, কোন পথে কোথা যাবে?

কিশোর ।। তা দিয়ে তোমার কি দরকার? বলছি, পথ ছেড়ে দাও...

মূর্তি ।। পথ ছাড়বো? যদি না ছাড়ি? যদি বলি ঃ পিপঁড়ের মত দু-আঙ্গুলে টিপে মেরে তোকে এই বনে ফেলে রেখে যাবো, তবে?

কিশোর ।। অ্যাঁ...আমাকে তুমি ...?

মূর্তি ।। হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ—

আমি রাবণ রাজার ঝি,
আমি আস্ত মানুষ একলা চিবোই,
ভাবছো তুমি কি?
তোমার মত মানুষ খোকা,
ওতো আমার মাথার পোকা,
একনিমেষেই সাবাড় করি,
হিঃ—হিঃ—হিঃ—হিঃ!

(বলেই লম্বা দুটি হাত বাড়িয়ে কিশোরকে ধরতে এলো। ভয়ে ভীত কিশোর ছুটে পালাতে না পেরে হঠাৎ মূর্চ্ছা গেলো। সঙ্গে সঙ্গে বনের নির্জনতা যেন আরও গভীর হয়ে এলো! ওদিকে অনতি দূর থেকে ভেসে এলো নূপুরের ধ্বনি। রাবণ রাজার ঝি তাই শুনে চমকে উঠলো।)

মূর্তি ।।(বাইরের দিকে তাকিয়ে) এই মেরেছে, এই বনে একটুও সুস্থির হয়ে বাস করতে পারবো না। ঐ দেখো, বন রানীর সখিরা আবার এদিকেই আসছে। থাকগে আগেতো পালাই।..

(প্রস্থান)

[ নূপুরের ঝংকার ধ্বনিতে মুখরিত করে নৃত্যের তালে তালে কয়েকটি সুন্দরী এলো ঐ বনের মধ্যে। সকলের চোখই মাটির দিকে। একান্ত মনে কি যেন খুঁজছে। এমন সময়.. ]

প্রথম সখি ।। না ভাই, রানীদির আংটি এত খুঁজেও যখন পেলাম না, আর বোধ হয় পাবোই না!

দ্বিতীয় সখি ।। সারাটা বন খুঁজে খুজে হয়রান হয়ে গেলাম। সত্যি, বলতো আংটিটা যাবে কোথায়?

তৃতীয় সখি ।। তা যাই বলো না ভাই, রানীদির প্রিয় আংটিটি কুড়িয়ে না পেলেই নয়। কত আদর করে ঐ আংটিটি...

প্রথম সখি ।। (চমকে উঠে) ওরে ঐ দ্যাখতো ওখানে অমন করে কে শুয়ে আছে? (সকলেই অবাক। চেয়ে দেখলো বনেরই এক প্রান্তে একটি কিশোর অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে! অনেকক্ষণ অনেক কিছু ভেবে নিয়ে ওরা তিনজন এগিয়ে গেলো।)

দ্বিতীয় সখি ।। তুমি কে ভাই?

তৃতীয় সখি ।। এ নিশ্চয় কোন মানুষ খোকা হবে! দেখে-শুনে যেন তাই মনে হচ্ছে।

দ্বিতীয় সখি ।। তাই তো মনে হচ্ছে।

প্রথম সখি ।। তাই যদি হচ্ছে, তবে এই গভীর গহন বনে কী করে এলো ঐ 'মানুষ-খোকা'?

তৃতীয় সখি ।। (এগিয়ে গিয়ে একটু নাড়া দিয়ে) তুমি, কে এখানে শুয়ে আছো, কী তোমার নাম? (সখির হাতে নাড়া পেয়ে কিশোর সাড়া দিয়ে উঠলো)

কিশোর ।। শ্যামলী, শ্যামলী? তোমরা কারা? আমার শ্যামলীকে দেখেছো তোমরা? আমার বোন ...

প্রথম সখি ।। তোমার বোন! তোমাব বোনকে খুঁজবে—তা এখানে এই বনের মধ্যে কেন?

কিশোর ।। (অবাক হয়ে) আমি কোথায়, কে নিয়ে এলো আমাকে এখানে? আমি কি তবে... (দূরে আবার নূপুরের আওয়াজ বেজে উঠলো। তারি সঙ্গে ধ্বনিত হলো শঙ্খধ্বনি। কিশোর অবাক চোখে এদিক ওদিক সব দিকে তাকাতে লাগলো।)

সখি তিনজন ।। ঐ যে রানীদি আসছেন!

কিশোর ।। রানীদি? কে সে?

প্রথম সখি ।। রানীদি হলেন এই বনের রানী। তাঁব কথায় এ বনের সবাই উঠে বসে!... (এবার রানীদি এলেন। তার সঙ্গে ঢুকলো আরও কয়েকজন সখি। সবার পায়েব ছন্দে নূপুরের ধ্বনি। সখিদের হাতে মঙ্গল শংখ। আর ডালায় ভরা ফুল! রানীদি প্রবেশ করলে সব সখিরা তাকে প্রণাম করলো।)

দ্বিতীয় সখি ।। তোমার আংটিটি তো এখনও খুঁজে পেলাম না রানীদি!

তৃতীয় সখি ।। আংটি খুঁজতে এসে খুঁজে পেলাম এক মানুষ খোকাকে। এসে দেখি বনের ঐ কোনে শুয়ে পড়েছিলো...

রানী ।। তোমার নাম?

কিশোর ।। (প্রণাম করে) আমার নাম কিশোর!

রানী ।। তা এখানে, এই গভীর বনে তুমি এলে কি করে?

কিশোর ।। আমার বোন, আমার হারানো বোন শ্যামলীকে খুঁজতে...আচ্ছা রানীদি আমার বোন শ্যামলীকে দেখেছো তোমরা?

রানী ।। শ্যামলী—না ভাই এ বনের মধ্যে তো কোন মানুষেরই আনাগোনা সম্ভব নয়।

কিশোর ।। তবে, তবে আমি এলাম কি করে? না আমায় ছেড়ে দাও, আমায় যেতে দাও বলে দাও কোন পথে গেলে আমি আমার শ্যামলীকে খুঁজে পাবো।

রানী ।। দাঁড়াও কিশোর। অমন চঞ্চল হলে চলবে কেন। একটু ধৈর্য ধরে দাঁড়াও। (রানীর সখিরা শঙ্খধ্বনী করে উঠলো। অন্যান্য সখীরা শুরু করলে পুষ্প বৃষ্টি। রানী একটু হাসলেন। সে হাসির ছোঁয়া আর সবাইকে ছুঁয়ে গেলো)

প্রথম সখি ।। সময় যে হয়ে গেলো রানীদি!

দ্বিতীয় সখি ।। হ্যাঁ--আরতো মোটেই সময় নেই...

রানী ।। যাবো বৈকি! কিন্তু বলো সখি এই কিশোরকে তো আর একা একা এই বনে রেখে যেতে পারি না। একটু পরেইতো বাঘ, হাতি, সিংহ, বানর সব পশু পাখিব দল এসে বিজয় উৎসবে মেতে উঠবে। ওরা তো আর তখন একে রেহাই দেবে না।

তৃতীয় সখি ।। হ্যাঁ রানীদি! বাঘ-মাসীতো এমনিতেই মানুষদের উপর ক্ষেপে আছে। সেই সেবার যখন তার বোনপোর মেঝো ছেলেটাকে একজন মানুষ এসে শিকার করে নিয়ে গেলো, তখন থেকেইতো মানুষের উপর ভীষণ আক্রোশ।...তাই...

রানী ।। আমিও তো সেই কথাই ভাবছি। চলো কিশোর, তুমি বরং আমার সঙ্গে চলো।...

কিশোর ।। তোমার সঙ্গে? না, না রানীদি, আমায় ছেড়ে দাও। আমার শ্যামলী যে আমার জন্য কাঁদছে। শ্যামলীকে আমার খুঁজে পেতে হবে—

রানী ।। কিন্তু পথে যে...

কিশোর ।। না রানীদি, পথের ভয় আমি করিনে। আমার বোনকে খুঁজতে গিয়ে যদি আমাকে বাঘের পেটেও যেতে হয়— তাতেও আমি ভয় পাইনা। তবুও আমার শ্যামলীকে খুঁজে পেতেই হবে। ছেড়ে দাও আমায়... (সখিরা আবার শঙ্খধ্বনি করলো। সুরু হলো পুষ্প-বৃষ্টি! রানীদির মুখে আবার হাসির রেশ। সেই রেশ ছড়িয়ে পড়লো

সখিদের চোখে-মুখে।)

**প্রথম সখি** । রানীদি, বেলা যে অনেক হলো। এবার...

**রানী।।** সখি, সব বুঝি আমি, কিন্তু ওকে তো ছেড়ে দিতে পারিনে। ওকে তো বাঁচাতে হবে। বোনের জন্য যে ভায়ের প্রাণ এমন করে কাঁদে তাকে বাঁচিয়ে না রাখলে চলবে কেন?

(বলেই রানী গলার মালাটি খুলে কিশোরের হাতে দিলো)

**রানী ।।** এই নাও ভাই কিশোর। এই হারটি তুমি হাতে রাখো। তোমার চলার পথে যদি কোনও পশুপাখী তোমায় তেড়ে আসে, তখন তুমি এই হারটি দেখিও—কেউ কিছু বলবে না বরং তোমার পথ দেখিয়ে দেবে, ওরা বুঝবে তুমি আমারই লোক।

(এবার রানীর উদ্দেশে কিশোর প্রণাম জানালো। শঙ্খ বেজে উঠলো! সকল সখিদের সঙ্গে রানীদি এগিয়ে চললেন আপন গৃহপানে। কিশোর তখন একা একা গভীর চিন্তায় মগ্ন। এমন সময় একটি বাঘ এসে প্রবেশ করলো। কিশোর চমকে উঠে থমকে দাঁড়ালো।)

**বাঘ ।।** এই যে—তুমি কে হে! দেখছি মানুষের বাচ্চা! তা বলি কোন মতলব নিয়ে এবারে আসা হয়েছে? আবার কাকে শিকার করতে এলে শুনি? (রেগে গর গর করে উঠলো) না—এবার আর তোমায় ছাড়ছিনে।

**কিশোর ।।** কেন বাঘ ভাই, আমি কি তোমার কোন ক্ষতি করেছি?

**বাঘ ।।** ছাড়ো ছাড়ো—পাকা পাকা বুলি ছাড়ো! তোমরা সব মানুষের দল ফন্দিফিকির না নিয়ে কি আর বনে আসো? তা যত চালাকই হও না কেন, এবার আর...

**কিশোর ।।** হ্যাঁ রানীদির মুখে তো শুনেছিই!

**বাঘ ।।** রানীদি? আমাদের বনের রানী? তাকে তুমি চেনো নাকি?

**কিশোর ।।** এই তো তার মালা রয়েছে আমারই হাতে এই দ্যাখো না?

**বাঘ ।।** রানীদি ভালোবেসে তোমায় এই মালা দিয়েছে? তা হলে তুমি নিশ্চয়ই ভালো মানুষ! তবে মানুষ হলেও তুমি নিমকহারাম বেইমান নও? তাতো হবেই; নইলে কি আমাদের রানীমা আদর করে তোমাকে তার মালাখানি দিয়ে দেন।

**কিশোর ।।** হ্যাঁ, রানীদি আমায় খুবই ভালোবাসেন...

**বাঘ ।।** এই দ্যাখো না ভাই মানুষ খোকা, এই সে বৎসর আমার বোনপোর ছেলেটাকে শিকার করে নিয়ে গেলো একটা মানুষ এসে...

(বলেই রাগে কটমট করে দাঁতে দাঁত কামড়াতে লাগলো।)

**কিশোর ।।** তা রানীদির মুখেই সব শুনেছি বাঘ-ভাই। কিন্তু আমি তো আর দোষী নই। জানো, কোলকাতার চিড়িয়াখানায় গিয়ে সেবার যখন দেখলাম, লোহার একটা খাঁচায় একটা বাঘকে কেমন করে আটকে রেখেছে! আর না খেয়ে খেয়ে সে বাঘটির চোখমুখ বসে গেছে, তখন আমার মনে কী কষ্টই না হয়েছিলো। তাইতো আমি বাবার কাছ থেকে ছয়টি পয়সা নিয়ে একটা রুটি কিনে ওকে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। বাঘটি তখন কী আনন্দ করেই না সেই রুটি টুকরো খেয়েছিলো। তারপর অনেক আশা নিয়ে আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে আমায় কী যেন বলতে চেয়েছিলো।

**বাঘ ।।** বুঝেছি ভাই, সব মানুষই সমান নয়। আমরাও কি সবাই সমান? কত বাঘ আছে, কারণে অকারণে কত মানুষ খুন করে। তাই তো আমাদের রানীদি বলেন, ভালো মন্দ সকলের মধ্যেই আছে। সত্য খোকন, তোমাকে পেয়ে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। আচ্ছা ভাই, তুমি এদিকে যাচ্ছিলে কোথায়?

**কিশোর ।।** আমি আমার বোনকে খুঁজছি। বলতে পারো, সবুজনদীর দেশ কোন পথে?

**বাঘ ।।** তুমি সেখানে যাবে? বেশ তো, চলো আমি তোমায় এগিয়ে দিচ্ছি। খুব বেশী দূরের পথ নয়। ঐ যে শালবন দেখা যাচ্ছে, ওরই পাশ দিয়ে যেতে হবে।

**কিশোর ।।** আচ্ছা আমি তবে চললুম। আবার নিশ্চয়ই তুমি রানীদির কাছে আসবে, তখন দেখা হবে, কেমন?

[ বাঘ হাসিমুখে বিদায় নিলো। কিশোর তখন সামনের দিকে এগোবে, কিন্তু আরেক দল বাঁদর, খরগোস ইত্যাদি পশুপাখি গান গেয়ে গেয়ে এসে বনের মধ্যে ঢুকলো। তাদের দলপতি হয়ে এলো শেয়াল। খোকন এবার অবাক হয়ে ওদের দিকে চাইলো। ওরা সব নৃত্য করতে করতে ঘুরতে লাগলো।

**পশুপাখির গান ।।**

আমরা যত বনের প্রাণী বনে বনেই থাকি?
নিত্য নূতন ছন্দে-গানে নূতন ছবি আঁকি!
বনের রানী শেখায় মোদের ভালোবাসার গান—
তাই আমাদের নেই ভেদাভেদ সবাই যে এক প্রাণ!

বানর ।। [কিশোরকে] তুমি বুঝি আমাদের রানীদির লোক?

শেয়াল ।। হ্যাঁ—তাই হবে, তাই। ঐ তো ওর হাতে রানীদির মালা!

খরগোস ।। বাঃ বেশ মজা হলো। আমরা আরেকটি নূতন বন্ধু পেলাম। বেশ মজা। বেশ মজা!! [আবার গান সুরু হলো তারপর ধীরে ধীরে ওরা এ-বন ছেড়ে অন্যদিকে এগিয়ে চললো। কিশোরও তখন রওনা হলো সবুজ নদীর দেশের দিকে।
কিশোর মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবছা আলোয় ভরা বনে আলোর ঝরণা নামলো। সমস্ত বনতল আলোময় হয়ে উঠলো। অপর দিক থেকে কিশোর আবার প্রবেশ করলো।]

কিশোর ।। হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঐ যে নদী বয়ে চলেছে! ঐতো—ঐতো শুনতে পাচ্ছি সবুজনদীর কলকাকলি। আহা—হা! প্রাণ জুড়ানো নদীর কলধ্বনি কতকাল পর শুনতে পেলাম! হ্যাঁ—হ্যাঁ ঐতো ঐতো, ওপারে সেই সবুজ শ্যামলিমায় ভরা গ্রাম। তবে কি ঐ ওপারেই জেগে আছে আমার হারানো বোন শ্যামলী? শ্যামলী, শ্যামলী? আর কতদূরে আছো শ্যামলী! সাড়া দাও—ভায়ের ডাকে সাড়া দাও। [উত্তেজিত কিশোর ভাবাবেগ নিয়ে এসে স্থির হয়ে কান পেতে রইলো। এখনই যেন সে শ্যামলীর সাড়া পাবে! ভাই-এর চোখ-মুখে অব্যক্ত আনন্দের প্রকাশ!]

কিশোর ।। তবে কি শ্যামলী এখন ঘুমিয়ে আছে? তবে কি...[ দূর থেকে ভেসে এলো একটি করুণ কান্নার সুর! সে সুর ক্রমে ছড়িয়ে পড়লো ব্যাপক হয়ে।]

আমি জেগে আছি জেগে আছি এখানেই—
আমার দুচোখে ঘুম নেই ঘুম নেই।
জাগো তুমি ভাই তোমার দৃপ্ত বলে
মুক্ত করো গো আমায় এ-শৃঙ্খলে!
শান্তি নামবে আমাদের মিলনেই!
আমার দুচোখে ঘুম নেই ঘুম নেই!

[ধীরে ধীরে গানের সুর মিলিয়ে এলো. কিশোর এবার আনন্দে অধীর হয়ে উঠলো।]

কিশোর ।। হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঐতো ঐযে, আমার শ্যামলীর কণ্ঠ। আমার শ্যামলী বেঁচে আছে, জেগে আছে আমার শ্যামলী। শুধু আমার শ্যামলীই নয়—হাজারো শ্যামলী আজ জেগে আছে। তাই যেতেই হবে। সবুজনদীর ঐ ওপারে আমাকে যেতেই হবে।
সূর্য উঠছে। সবুজ ভোরের এই নরম আলো ঐ দেশের আকাশে বাতাসেও নিশ্চয়ই ছড়িয়ে পড়েছে। ওরাও তাই জেগেছে। না আর অপেক্ষা নয়। আমাকে যেতেই হবে।

[কিশোর দ্রুতবেগে এগিয়ে চললো। দূর থেকে একটি সমবেত সুর ভেসে এলো।]

[আশ্বিন, ১৩৬৭]

—যবনিকা—

[পৃথিবীব বিখ্যাত উপন্যাসগুলোকে সংক্ষেপে ছোটদেব মতো কবে মাঝে মাঝে এ-বিভাগে তুলে ধবা হবে। এবাব 'মবিডিক' অথবা 'শ্বেত তিমি'—যা বিশ্বেব সাহিত্যভাণ্ডাবেব এক অমূল্য সম্পদ, তা প্রকাশ করা হলো। —সম্পাদক]

# মবিডিক

### উপমন্যু

অচেনা শহব। শীতেব বাত। এবই মধ্যে একটা আশ্রয় খুঁজছিলাম আমি। কনকনে হাওযায কাঁপতে কাঁপতে বাস্তায বাস্তায একটা সস্তা হোটেলেব সন্ধান কবছিলাম। খুব কষ্ট হচ্ছিল। মনে মনে বললাম "ইসমেল, তুমিতো ভবঘুবে। আব দুদিন বাদেই অজানা সমুদ্রে ভাসবে। যে তিমি শিকাব কবতে যাবে তাব কি এত সহজে ভেঙ্গে পডলে চলে?"

শেযে নিউ বেড-ফোর্ড শহবেব একটা নির্জন বাস্তায হোটেলেব সন্ধান পেলাম। পিটাব কফিনেব হোটেল। বাইবেব হলে মাঝমাল্লাব ভীড, দেয়ালেব গাযে ঝুলছে নানা তিমি শিকাবেব সবঞ্জাম। পছন্দ হল হোটেলটা। কিন্তু মালিক জানালেন—কোন ঘব খালি নেই। তবে আব এক দলেব সঙ্গে থাকতে যদি আপত্তি না থাকে ।

বাজী হলাম। বাত্রে সেই অন্য জনেব সঙ্গে দেখা হল। বিছানায শুযে তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ দপ দপ আওযাজে চমক ভাঙ্গল। চোখ মেলে দেখি সামনে দাঁডিযে আছে এক বিবাট দৈত্য। দক্ষিণ সমুদ্রেব কোন নির্জন দ্বীপ থেকে বেবিযে এল এই নবখাদক? আব এল কি না আমেবিকাব শহবে। সাদা কামানো মাথা লোকটাব। চকচকে তামাটে বঙেব দেহে কালো চৌকো উল্কি আঁকা। মুখে একটা পাইপ, হাতে একটা নবমুণ্ড। ভযে চোখ বুজে ঘুমোবাব ভান কবলাম।

ঘুমিযেই পডেছিলাম। সকালে উঠে চোখ পডল ভালোমানুষেব মত পাশে বসে হাসছে লোকটা। আলাপ হল। দেখলাম সত্যই সুন্দব মানুষ কুইকোযেগ। যেমনি ধীব স্থিব তেমনি ধর্মভীরু। ভালবেসে ফেললাম কুইকোযেগকে। কুইকোযেগ একজন হার্পুনাব অর্থাৎ বর্শা ছোডায় পাকা ওস্তাদ। ঠিক হল, আমবা দুজনে এক সঙ্গে, একই জাহাজে তিমি শিকাবে বাব হব।

পবদিন একটা ছোট্ট জাহাজে চডে ন্যানটাকোট শহবেব পথে যাত্রা কবলাম আমবা। ন্যানটাকোট থেকেই শুরু হবে আমাদেব তিমি শিকাবেব অভিযান। তিমি শিকাবেব জন্য বিশেষ ধবনেব জাহাজ আছে, সেই জাহাজে। যাবা যাবে তাদেব মধ্যে অনেকেই আব ফিবে আসবে না। তবু যাবে, প্রত্যেক বছবই যায়।

আমবা দুজনেও ছোট্ট জাহাজে চডে যাচ্ছিলাম। পথে ঝড উঠল। মোচাব খোলাব মত দুলে উঠল জাহাজটা। পাল হেলে পডল। টাল সামলাতে না পেবে একজন নাবিক ছিটকে পডল জলে। আমাব পাশে দাঁডিযেছিল কুইকোযেগ। সঙ্গে সঙ্গে সেও জলে ঝাঁপিযে পডল। কুইকোয়েগ ছিল বলেই সে যাত্রা বেঁচে গেল নাবিকটা। অসভ্য কুইকোয়েগেব চবিত্রেব আব একটা মহৎ দিক দেখাব সৌভাগ্য হল।

ন্যানটাকোট পৌছে তিমি শিকাবেব জাহাজ 'পিকো'-তে কাজ পেলাম আমবা। কাজটা আমিই জোগাড কবলাম। কুইকোযেগেব সেটা উপোস আব পূজোব দিন। তাই সে বাব হযনি।

'পিকো' জাহাজটাও আমি পছন্দ করেছিলাম। জাহাজটা পুবনো কিন্তু মজবুত। ভেতবেব আবহাওযা কেমন বিষাদমলিন। ঐতিহ্যেব গাযে একটু বিষাদেব ছাপ তো থাকবেই।

আমাব প্রধান আকর্ষণ অবশ্য ছিল জাহাজেব কাপ্তেন। কাপ্তেন আহাব সেবা তিমি-শিকাবী। আমাদেব কাজে ভর্তি কিন্তু কবলেন জাহাজেব দুই মালিক। তিন বছরের চুক্তি হল। তিন বছব ভাসতে হবে সমুদ্রে। বেঁচে ফিবে আসলে পাওয়া যাবে, তিমিব চামডা আব তেল বেচা আয়ের তিনশো ভাগেব এক ভাগ। অনেক চেষ্টা কবেও কিন্তু কাপ্তেন আহাবেব দেখা পেলাম না।

শুনলাম আগের বছর তিমির তীক্ষ্ণ দাঁতে কাপ্তেন আহাবের একটা পা কাটা পড়েছে। সেই থেকেই বন্ধ কেবিনে বসে থাকে কাপ্তেন। নাবিকদের সামনে আর বিশেষ বার হন না।

কুয়াশাচ্ছন্ন এক সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়ল। মালিকদের নৌকা সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা এসে ফিরে গেল জনপদের পানে। আমরা এগিয়ে চললাম তুষারাবৃত অসীম আটলাণ্টিক মহাসাগরের গভীরে।

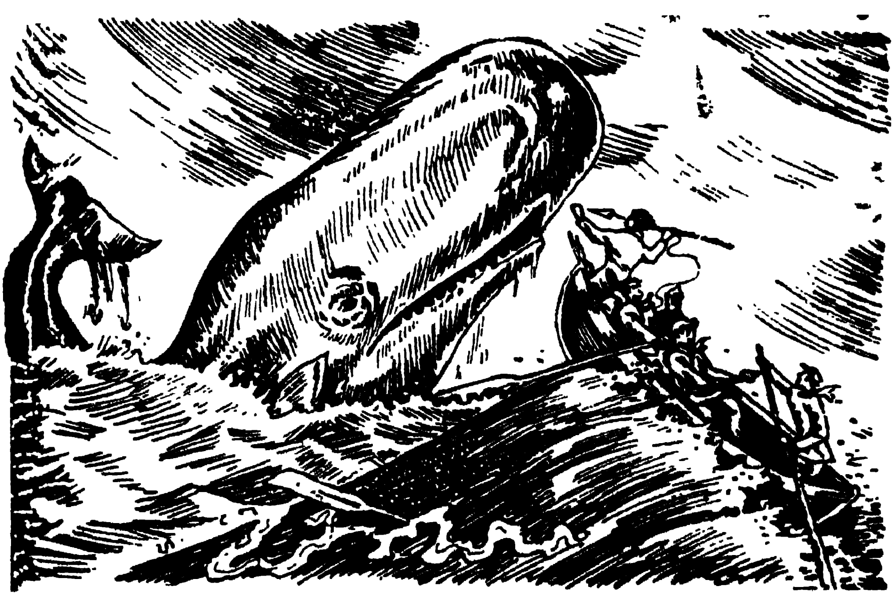
জাহাজ চলেছে তো চলেছেই। কিন্তু তখনও কাপ্তেন আহাবের দেখা নেই।

আড়াল থেকে হুকুম দিচ্ছিলেন আহাব। হুকুম তামিল করছিল তিনজন মেট। ছোট্ট জাহাজ চলেছে তো চলেছেই কিন্তু তার সরঞ্জাম অনেক। তিন বছর থাকতে হবে সমুদ্রে। সুতরাং প্রয়োজনীয় সব জিনিসের প্রচুর সঞ্চয় সঙ্গে নিয়ে বার হতে হয়েছিল।

স্টারবাক, স্টাব্ আর ফ্লাস্ক, এই তিনজন মেট। স্টারবাক বেশ বিচক্ষণ আর বুদ্ধিমান লোক। স্টাবের বাড়ি কেপকড। বেশ, হাশিখুশি আমুদে মানুষ। ফ্লাস্ক সাহসী, দুর্দান্ত ধরনের মানুষ। তিমি দেখলেই তিন খানা হোয়েল বোট নিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে এই তিনজন। তাদের সঙ্গে প্রত্যেক বোটে থাকবে একজন হার্পুনার, হার্পুন অর্থাৎ বর্শা ছোঁড়ায় ওস্তাদ। স্টারবাকের নৌকায় থাকবে কুইকোয়েগ, স্টাব সঙ্গে নেবে রেড ইন্ডিয়ান টাসটেনোকে আর ফ্লাস্কের পাশে থাকবে নিগ্রো ডাগনু। তা ছাড়া থাকবে অন্যান্য মাঝি-মাল্লাদের মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া দু'একজন। যেমন কুইকোয়েগের সঙ্গে থাকবো আমি।

তিমি কিন্তু তখনও দেখা যায়নি। জাহাজ চলেছে তো চলেছেই।

হঠাৎ একদিন দেখা পেলাম কাপ্তেনের আহাবের। ওপরের ডেকে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন কাপ্তেন। মুখ গম্ভীর, চোখে পলক পড়ছে না। তিমির দাঁতে গড়া নকল পা-টা রোদ পড়ে চকচক করছে। ভয়ে এবং বিস্ময়ে কেন কে জানে শিউরে উঠলাম আমি।



এরপর আবার একদিন শিউরে উঠলাম। শিউরে উঠলাম কাপ্তেনের কণ্ঠস্বর শুনে। জাহাজের সব লোক জড়ো হয়েছিল ডেকে। ওপরের ডেকে দাঁড়িয়ে বলছিলেন কাপ্তেন আহাব "তিমি শিকার করতে হবে আমাদের। অনেক তিমি। কিন্তু আমাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে একটা সাদা তিমি, গায়ে তার তিনটে গভীর ক্ষত। যে তাকে মারতে পারবে সেই পাবে এই স্বর্ণমুদ্রা।" কাপ্তেনের ডান হাতে চকচক করে উঠল একটা স্বর্ণমুদ্রা।

"মবিডিক্। সাদা তিমি, মবিডিকই কি আমাদের লক্ষ্য?" প্রশ্ন করল স্টারবাক।

"হ্যাঁ, সেই শযতান মবিডিককে মাবতে হবে আমাদেব। সেই কেটে নিয়েছে আমাব পা, আমাকে পঙ্গু কবে দিযেছে।" শেষেব দিকে কেমন করুণ হযে এল কাপ্তেনেব কণ্ঠস্বব।

মবিডিকেব কথা ভাবতে ভাবতে ভেসে চলেছি আমরা। হঠাৎ একদিন দূবে দেখা গেল তিমিব দল। বোট নিযে জলে ঝাঁপিযে পডলাম আমবা আলাদা একটা বোট নিযে নামলেন কাপ্তেন আহাব। তাঁব পাশে দাঁডিয়ে হার্পুনাব ফেডাল্লা। নবখাদক বিবাট দেহ ফেডাল্লাকে সেই প্রথম দেখলাম আমবা।

আকাশে মেঘ জমেছিল। অন্ধকাব সমুদ্রে এগিযে চলেছিল্ আমাদেব বোট। অন্যেবা দূবে চলে গেছে, দেখা যাচ্ছিল না তাদেব। স্টাববাকেব খেযালই নেই। এমন সময আচমকা আমাদেব সামনে ভেসে উঠল তিনটে তিমি। ঝড উঠেছে তখন। দুলছে নৌকাটা। তাবই মধ্যে একটা তিমিব মাথা লক্ষ্য কবে কুইকোযেগ ছুঁডে দিল তাব ধাবালো বর্শা।

তিমিটাকে অনুসবণ কবা কিন্তু সম্ভব হ'ল না। প্রচণ্ড ঢেউ লেগে বোটটা উল্টে যায আর কি। সাবা বাত জল আব ঝডেব সঙ্গে যুদ্ধ কবে জাহাজে ফিবে এলাম আমবা। অন্যেবা ঝড ওঠবাব আগেই ফিবে এসেছিল।

এবপব একদিন একটা সাদা মাছ দেখে বিভ্রান্ত হ'লাম আমবা। তাব বিশাল দেহটা সমুদ্রে ভাসছিল আব ডুবছিল। স্কুইড অর্থাৎ টোপ জাতীয মাছ। কুইকোযেগ বলল 'খাদ্য যখন দেখা গেছে, খাদকও আব খুব দূবে নেই।"

সত্যিই দূবে ছিল না। পবেব দিনই সমুদ্রে ভেসে উঠল একটা বিশাল তিমি মাছ। স্টাবেব বর্শাব আঘাতে নিহত হ'ল তিমিটা। সে এক অবর্ণনীয ব্যাপাব। আক্রান্ত হ'যে সমুদ্র তোলপাড কবে তুলল তিমিটা। বক্তে লাল হ'যে উঠল নীল জল। হাঙ্গবেব ধাবালো দাঁত বাচিয়ে সেই বিশাল দেহ টেনে আনাও এক লঙ্কাকাণ্ড।

তাবপব ছাল ছাড়ানো, দেহেব বিভিন্ন অংশ কেটে কেটে বাখা, দাত আব হাড যত্ন কবে বিচ্ছিন্ন কবা—সব মিলিযে জাহাজশুদ্ধ লোক হিমসিম খাবাব জোগাড। তিমিব দাঁত অতি মূল্যবান বস্তু। আব তেল, শত শত গ্যালন তেল পাওযা যায তিমিব দেহ থেকে।

তিমিব মাথাব খোল থেকে তেল তুলতে গিযেই এক বিপত্তি হ'ল। টাসটেগো পা ফস্‌কে টুপ কবে পড়ে গেল খোলেব মধ্যে আব সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা খেযে মাথাটাও ছিটকে পডল সমুদ্রে। এবাবও একটা ছুবি নিযে জলে ঝাঁপিযে পডল কুইকোযেগ। মাথাব একাংশ কেটে বক্ষা কবল টাসটেগোকে। মাথাটা অবশ্য আব বক্ষা কবা গেল না।

আবাব চলছিল জাহাজ। সমুদ্র থেকে সমুদ্রান্তবে। মবিডিকেব কিন্তু দেখা নেই।

মাঝে অসুখে পডল কুইকোযেগ। জাহাজেব ফুটো সাবাবাব জন্যে প্রায়ই বেচাবিকে ডুবতে হ'ত সমুদ্রে। আব তাতেই তাব জ্বব হ'ল। জ্বব বেডে উঠল। কফিন তৈবি হ'ল তাকে কবব দিতে হবে বলে। কিন্তু সে যাত্রা বেঁচে গেল কুইকোযেগ। কফিনটা জাহাজেব পেছনে বাঁধা হযে পড়ে বইল।

পথে নানা জাহাজেব সঙ্গে দেখা হয। কাপ্তেন আহাবেব মুখে এক প্রশ্ন— "মবিডিক, সাদা তিমিটাব দেখা পেলে?" শেষে খবব মিলল ব্যাচেল জাহাজেব কাপ্তেনেব কাছে। মবিডিকেব সঙ্গে যুদ্ধে পবাজিত কাপ্তেন তখন খুঁজে বেডাচ্ছেন তাঁব হাবানো বোট। তাঁর বাবো বছবেব ছেলে ছিল সেই বোটে।

কাকব কান্নায় কান দেবাব সময নেই আহাবের। আমাদেব জাহাজ ছুটল মবিডিকেব সন্ধানে।

দূবে, ওই দূবে তুষাবশুভ্র একটা পর্বতেব মত ভাসছে মবিডিক।

প্রথম যুদ্ধে হেবে গেলাম আমবা। আহাবেব বোটেব অর্দ্ধেকটা চিবিযে খেয়ে ফেলল সেই বাক্ষুসে তিমি। দ্বিতীযবারও সেই এক দশা। তিনখানা বোটই চূর্ণ হ'ল আব তার সঙ্গে চূর্ণ হ'ল আহাবেব নকল পা। প্রাণ হাবালো আহাবেব বিশ্বস্ত হার্পুনাব ফেডাল্লা।

বাব বাব তিন বাব। দু'দুবাব তীক্ষ্ণ বর্শাব আঘাতে ক্ষেপে ছিল মবিডিক। প্রথমেই সে লেজেব ঝাপটায ভেঙে দিল দু'খানা বোট। পাগলেব মত জল তোলপাড কবতে কবতে তাব সামনে পডল জাহাজটা। এক আঘাতে উডিয়ে দিল জাহাজেব একটা পাশ। তাবপব জাহাজেব তলা দিযে হুস কবে ভেসে উঠল। সামনেই আহাবেব নৌকা।

প্রস্তুত হযেছিলেন আহাব। তীব্র বেগে বিঁধে দিলেন তাঁব শাণিত বর্শা মবিডিকেব সাদা দেহে। যন্ত্রনায ছুটে চলল মবিডিক। শোঁ শোঁ কবে লাটাই শূন্য হযে ছুটে যাচ্ছিল বর্শায় লাগানো সুতো। কিন্তু এ কি হ'ল? জট

পাকিয়ে যাচ্ছে সুতোটা। মাথাটা নীচু করে হাত বাড়ালেন আহাব। চোখের পলকে সেই মোটা সুতো জড়িয়ে গেল তাঁর গলায়। পালকের মত আহাবের দেহটা একবার শূন্যে উঠে মিলিয়ে গেল উত্তাল সমুদ্রে। সব শেষ।

সত্যিই সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। জাহাজটা ডুবে গিয়েছিল। কালো তৈলাক্ত জলে ভাসছিলাম আমি। পরিচিত কেউ নেই আশে পাশে। শুধু ঢেউ আর ঢেউ। এমন সময় ভেসে এল সেই কুইকোয়েগের জন্যে তৈরি কফিনটা। কিন্তু কোথায় হারিয়ে গেল কুইকোয়েগ?

সেই কফিনটা অবলম্বন করে অসীম সমুদ্রে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ভাসছিলাম আমি। "র‍্যাচেল" জাহাজ এসে রক্ষা করল আমাকে। 'পিকো' জাহাজের একমাত্র প্রতিনিধি আমি রক্ষা পেলাম এই কাহিনী বলব ব'লে।

[কার্ত্তিক, ১৩৬৭]

["মবিডিক অথবা সাদা তিমি" হারম্যান মেলভিলেব সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি। আমেরিকার সাহিত্যিক মেলভিলের জন্ম ১৮১৯ সালে, মৃত্যু ১৮৯১ সালে। তিমি শিকারের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে "মবিডিক" রচনা কবেন মেলভিল। কিন্তু জীবিতাবস্থায় কোন সম্মান তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। প্রায় অখ্যাত অজ্ঞাত অবস্থায় মৃত্যু হয় মেলভিলের। আজ কিন্তু "মবিডিক" বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি বলে স্বীকৃত।]

[কার্ত্তিক, ১৩৬৭]



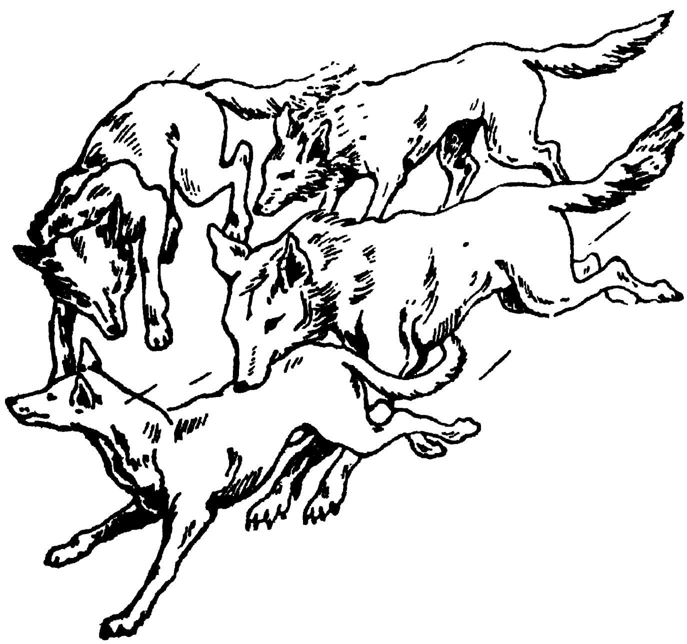
# ভুলুয়া

## শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি)

তোমাদের সকলেরই বন্ধু আছে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কারও পোষা কুকুর থাকে, তাহলে জেনো সবচেয়ে ভালো বন্ধু সে-ই পেয়েছ। কারণ, কুকুর যে শুধু পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বাসী আর অনুগত জীব তা নয়, বরং বলা যায় তারা তাদের মানুষ-মালিকদের মতো কখনও বিশ্বাসঘাতকতা বা অকৃতজ্ঞতার কাজ করে না।

সত্যি কথা বলতে কি, আমরা যারা কুকুর পুষি, তারা খুব কমজনেই তাদের পোষা কুকুরটির ভালবাসার যোগ্য প্রতিদান দিতে পারি। এই পোষা-জানোয়ারটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো যে—তোমার পোষা কুকুরটি কখনও তুমি অন্যায় কাজ করছো কি ন্যায় কাজ করছো, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। গরীব বা বড়লোক, মূর্খ বা জ্ঞানী, পাপী কি পুণ্যাত্মা হও না তোমরা, তোমাদের পোষা কুকুরটি তার কোনও ধারই ধারে না। কুকুরটি তোমাকে ভালবাসবে আর মানবে এমনভাবে, যেন তুমিই তাকে সৃষ্টি করেছে, যেন তুমিই তার ভগবান। কুকুর এদিক থেকে মানুষের চেয়ে অনেক মহৎ।

ঝড় আসুক, প্রলয় ঘটুক—তুমিই তার সবচেয়ে বড় বন্ধু, এই কথাই সে জানে। তোমাকে সে আঁকড়ে থাকবে, আগলে রাখবে, সুখে-সম্পদে, আপদে বিপদে সব সময়েই তোমার ভালোব জন্যে, একমাত্র তোমার পোষা কুকুরটিই জানবে তার প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে—কোনও তারিফ বা পুরস্কারের আশা না রেখেই। মনিবের জন্যে কুকুর প্রাণ দিয়েছে এমন ঘটনা পৃথিবীতে অনেক ঘটেছে, কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই দেখা যায়নি কুকুর বোকার মতো আত্ম-বলিদান করেছে। বরং কুকুর হামেশাই বুদ্ধি আর সাহসের এমন সব প্রমাণ-পরিচয় দেয়, যখন তার চারপাশের মানুষ ভয়ে দিশেহারা হয়।



এমনি একটি কুকুর ছিল ভুলুয়া। হাজারীবাগের গভীর জঙ্গলের মইবোঙা গ্রামে কাঠুরে সোনাই মাঝির ঘরে পোষা। সোনাই, তার বউ কুকুরটাকে ছেলের মতোই ভালবাসতো। দামী জাতের কুকুর নয় ভুলুয়া। জংলী কুকুরের বাচ্চা; বড় হয়েছে মনিবের ঘরের মোটা শাক-ভাত খেয়েই। কিন্তু অন্তরটা ছিল তার কত মহৎ, গল্পটা পড়লেই বুঝতে পারবে।

সোনাইয়ের একটি খোকা ছিল। ভুলুয়া তাকে ভারী ভালোবাসতো। তাকে আগলাতো, আর খেলতো বাচ্চা খোকাটির সঙ্গে। সোনাই বনে গেলে তার সঙ্গে সঙ্গে যেতো।

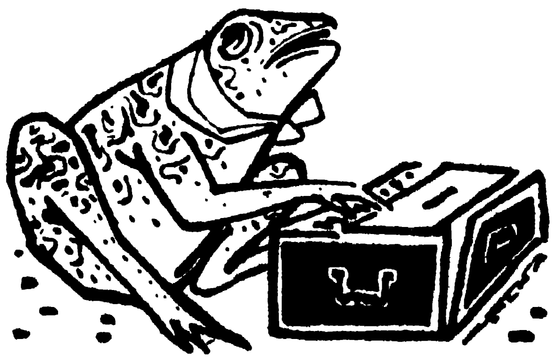
একদিন সোনাই ভুলুয়াকে সঙ্গে নিয়ে কাঠ কাটতে গেছলো জঙ্গলে। সোনাইয়ের বউ গেছলো হাটে—ছেলেটাকে উঠোনের গাছের দোলনাতে ঘুম পাড়িয়ে রেখে।

সন্ধ্যেবেলা জঙ্গল থেকে ফিরে উঠোনে পা দিতে গিয়েই সোনাই দেখল তিন তিনটে বড় নেকড়ে বাঘ দোলনার দিকে গুটি গুটি এগুচ্ছে। সোনাইতো তা দেখে একেবারে ভয়ে কাঠ, পা আর তার নড়ে না। মুখে রা ফোটে না—ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে থ'। ভুলুয়া কিন্তু মোটেই ভয় পেলে না।

ভুলুয়া লাফ-ঝাঁপ হাঁক-ডাকও করলে না বা নেকড়েদের মধ্যে তেড়ে ছুটে গেলো না। কারণ সে যে কুকুর। সে ভাল করেই জানতো যে সে যদি নেকড়েদের তেড়ে যায়, তা হলে তারা তাকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলবে—খোকাটাকেও বাঁচানো যাবে না। তার বদলে তাই সে খানিকটা এগিয়ে, দূর থেকেই নেকড়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। থমকে দাঁড়িয়ে গোঁ গোঁ করতে লাগলো—জ্বল জ্বলে চোখ দুটো জ্বালিয়ে। নেকড়েগুলোও রেগে তেড়ে এলো তাব দিকে। তখন সেও উল্টো দিকে পাঁই পাঁই করে ছুট্ লাগিয়ে ঢুকলো গিয়ে জঙ্গলে। নেকড়ে তিনটেও তার পিছু পিছু দৌড়লো। সোনাইও সেই ফাঁকে ছুটে গিয়ে তার খোকাটিকে সাঁ করে দোলনা থেকে তুলে নিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকলো। খোকাটা নেকড়ের মুখ থেকে বেঁচে গেল।

ভুলুয়া কিন্তু সেই যে গেল, আর ফেরেনি সোনাইয়ের ঘরে। সে তার মনিবের প্রতি ভালবাসার চরম পরিচয় দিতেই নিজের জীবনটা বলি দিলে নেকড়েদের মুখে। কিন্তু গোয়ার্তুমি বা ঝোঁকের মাথায় সে এ কাজটা করেনি। বুদ্ধি খাটিয়ে ভেবেচিন্তেই করেছিল তার কর্তব্যটি। মানুষের জন্যে মানুষ বন্ধু কি পারতো এমন ভেবেচিন্তে প্রাণ দিতে? তাই বলছি কুকুরই হলো মানুষের সবসেরা বন্ধু। এই ঘটনার কথা সোনাই কাঠুরে বলেছিল আমারই এক শিকারী বন্ধুর কাছে। তাঁর কাছ থেকেই আমি শুনি এটি। আজ তোমাদের আবার শোনালাম সেই ভুলুয়ার কথা—যার কথা আমাদের কারুরই ভোলা উচিত নয়।

[কার্তিক, ১৩৬৭]



## ।। ছড়া ।।

জ্যোতিভূষণ চাকী

ফুড়ুক ফুড়ুক
তামাক পুড়ুক
ঠাকুর-দাদা
গল্প জুড়ুক
ধোঁয়ার পাখায়
মনটা উড়ুক
গুড়ুক গুড়ুক
তামাক পুড়ুক!

[আশ্বিন, ১৩৬৭]

## ।। ট্যারা সেনাপতি ।।

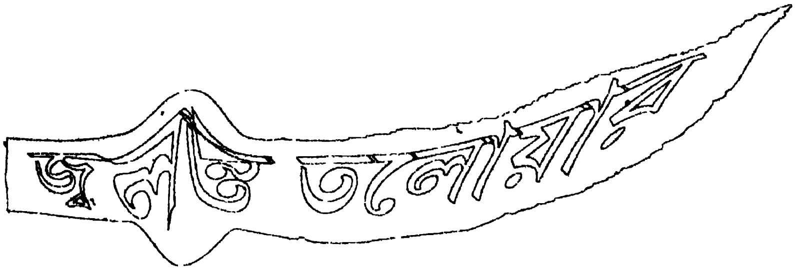
শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়

কান কাটা রাজারানী কানপুরে আছে,
তানপুরা নিয়ে তারা বসে থাকে গাছে ঃ
পান খায় খিলি খিলি, গান গায়...সারে
গামা পাধা...বড় মামা গাধা একেবারে!
সেই গান শুনে মামা জামা-জুতো নিয়ে
শিলিগুড়ি চলে গেছে হামাগুড়ি দিয়ে!

চোখ-ট্যারা সেনাপতি দিনে দেখে তারা,
ছাতে এনে পুঁতে রাখে তেঁতুলের চারা
বলে, এই গাছে উঠে চাঁদ ধরে হাতে
তেল-নুন মেখে খাবো পূর্ণিমা রাতে!
সেই কথা শুনে রাজা গান গায়...পাধা
নিসা সানি...সেনাপতি একেবারে গাধা!

সেনাপতি রেগে উঠে বলে, তবে...সানি,
গাছ থেকে নেমে আয় গাধা রাজারানী ঃ
গোলমেলে হাওয়া দেখে রাজা বলে...অতি
ভালো ছেলে আমাদের ট্যারা সেনাপতি!

[ কার্তিক, ১৩৬৭]




অধ্যাপক সমর গুহ

১৯৩১ সাল। ছাব্বিশে জানুয়ারীর স্বাধীনতা দিবস। এই দিবসে সারা ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে ওঠে জাতীয় পতাকা—পল্লীতে পল্লীতে শহরে শহরে সম্মিলিত কণ্ঠে ঘোষিত হয় স্বাধীনতার সংকল্প বাণী।

কিন্তু না,—ইংরেজ সরকার দেবে না জাতীয় পতাকা তুলতে, দেবে না জনতাকে একত্র হয়ে স্বাধীনতার সংকল্প বাণী ঘোষণা করতে। ত্রিরঙা জাতীয় পতাকা যে বিদ্রোহের পতাকা! স্বাধীনতার সংকল্প বাণী যে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিনাশের শপথ-বাণী। ইংরেজ সরকার স্থির করলো সমস্ত শক্তি দিয়ে স্বাধীনতা দিবসের উদ্‌যাপন বন্ধ করতে হবে।

সমগ্র দেশে তখন চলেছে আইন অমান্যের এক বিরাট জাতীয় আন্দোলন। হাজার হাজার ভারতবাসী কারাবরণ করছে। মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আজাদ, রাজেন্দ্র প্রসাদ, খান আবদুল গফ্‌ফর খান, মতিলাল, সরোজিনী নাইডু, রাজাজী, জওহরলাল সবাই তখন জেলে। সমগ্র দেশে চলেছে তখন আইন অমান্য, বয়কট ও পিকেটিং—দেশের সর্বত্র আওয়াজ উঠেছে ইংরেজের আইন মানব না, বিলিতি জিনিস কিনব না।

এক বছর ধরে চল্‌ছে এই আইন অমান্য অন্দোলন। সারা ভারতবর্ষে চলছে নিরস্ত্র জনতার শান্তিপূর্ণ বিদ্রোহ। ইংরেজ সরকারের ক্ষীপ্ত রুদ্র মূর্তি। লাঠি চলেছে গুলি চলেছে—স্বাধীনতা-সংগ্রামী জনতার উপর নিপীড়ন আর অত্যাচারের সীমা নেই। হাজার হাজাব নয় শুধু, লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী গ্রেপ্তার হচ্ছে। শুধু বড়োরাই নয়— হাজার হাজার তরুণ তরুণী, কিশোর কিশোরীরাও ঝাপিয়ে পড়ছে শেকল ভাঙ্গার মুক্তি সংগ্রামে।

১৯৩০ সাল। সারা বছর ধরে চললো ভরতীয় জনতার এই নিরস্ত্র বিদ্রোহ। অভূতপূর্ব জাতীয় সংগ্রামের রক্ত রাঙা পথে ঘুরে এলো একটি বছর,—১৯৩১ সাল। দেশবাসী সংকল্প করলো—দীপ্ত তেজে উদ্‌যাপিত করতে হবে ছাব্বিশে জানুয়ারীর স্বাধীনতা দিবস। দেশের সর্বত্র গেল স্বাধীনতার সংকল্প বাণী পাঠের নির্দেশ।

ইংরেজ সরকার ক্ষেপে উঠলো বিদ্রোহী ভারতবাসীর এই স্পর্ধিত ঘোষণায়। জাতীয় পতাকা?—কার জাতীয় পতাকা? এতো বিদ্রোহের পতাকা। ভারত সরকারের পতাকা হলো ইউনিয়ন জ্যাক। ইংরেজ সরকার কিছুতেই দেবে না বিদ্রোহীদের এই ত্রিরঙা ঝাণ্ডা উড়াতে। চরম, তীব্র, কঠোর দমন নীতির ক্রুদ্ধ হুকুম দিল ইংরেজ সরকার। কোন পার্কে সভা করা চলবে না, কোথাও ত্রিরঙা ঝাণ্ডা উড়ানো চলবে না।

ইংরেজ সরকারের প্রত্যুত্তর এলো নেতাজীর কণ্ঠ থেকে। নেতাজী তখনও নেতাজী হন নি। তিনি তখন তরুণ সুভাষচন্দ্র বসু—কলকাতা করপোরেশনের কনিষ্ঠতম মেয়র। তিনি প্রকাশ্যে জানিয়ে দিলেন—জাতীয় পতাকা তোলা হবে কলকাতা শহরেরই মর্মকেন্দ্রে, মনুমেন্টের তলায়। আরও জানান হলো, এই পতাকা তুলবেন স্বয়ং কলকাতার মেয়র—শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু।

সংবাদ শুনে ইংরেজ সরকার তো ক্রোধে আগুন। এতবড় স্পর্ধা! যে ইংরেজ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না, তার সরকারকে চ্যালেঞ্জ! ইংরেজ সরকার হুকুম দিল, যে কোন উপায়েই হোক মনুমেন্টের তলায় বিদ্রোহের পতাকা তোলা বন্ধ করতে হবে। পরোয়ানা জারী হলো কলকাতার মেয়র সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তারের।

কিন্তু কোথায় সুভাষ বসু! সহরের অনেক লোক গ্রেপ্তার হলো। কলকাতার পার্কে পার্কে জাতীয় পতাকা তুলবেন বলে যাঁদের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল—পুলিশ চড়াও করলো তাঁদের সবাইকার বাড়ি। প্রায় সব

নেতাকেই ধবে নিয়ে আটকে বাখা হলো জেলে, নয় লালবাজাবে। পুলিশ এলগিন বোডেও ছুটল। কিন্তু কোথায় কলকাতাব মেযব সুভাষচন্দ্র বসু—যে ইংবেজ সবকাবকে জানিয়েছে স্পর্ধিত চ্যালেঞ্জ! বাডিব লোকেবা জানিয়ে দিলেন— মেযব বাড়ি নেই।

পুলিশেব বড সাহেব চোখ লাল কবে জিজ্ঞাসা কবলো—হোযাব হ্যাজ হি গন?—কোথায় গেছেন তিনি?

শান্ত ও সংক্ষিপ্ত সুবে বসু বাডিব লোকেবা জবাব দিলেন জানি না।

কলকাতাব আবহাওযা গুজবে উত্তেজনায উত্তপ্ত হযে উঠলো। পুলিশ তন্ন তন্ন কবে খুঁজতে লাগলো কলকাতাব মেযব সুভাষ বসুকে। কিন্তু কোথাও পাওযা গেলো না তাঁব সন্ধান।

কোথায গেলো সুভাষ বসু? সত্যাগ্রহী নেতাবা তো পালায না। আইন অমান্য কবে স্বেচ্ছায ধবা দেয, গ্রেপ্তাবি পবোযানা জাবি হলে কোর্টে হাজিব হয, বাডিতে পুলিশ গেলে পুলিশেব সঙ্গে চলে আসে -পুলিশ তো এমনি বীতিব কথাই জানে। কিন্তু সুভাষ বসু কি তবে আব কোথাও পালাল নাকি?



পুলিশেব বড কর্তাদেব বৈঠক বসলো। ইতিকর্তব্য স্থিব কবতে হবে সবকাবকে। আই বি বিভাগেব এক কর্তা বললেন—স্যাব, সুভাষ বসুব বিবোধী দলেব লোকেবা বলছে সুভাষ বসু গ্রেপ্তাবেব ভযে আত্মগোপন কবেছে। পুলিশেব বডকর্তা ট্যাগার্ড সাহেব ঝাঁঝাল কণ্ঠে ধম্‌কে দিল ছোট কর্তাটিকে —ফুল! হোযাট ডু ইযু নো অ্যাবাউট সুভাষ বসু? সুভাষ বসু সম্বন্ধে তুমি কি জান? সুভাষ বসু আব সব নেতাদেব মত শুধু সত্যাগ্রহে বিশ্বাস কবে না। হি ইজ এ বেভল্যুশনাবী। সুভাষ বিপ্লবী। ঠিক দেখবে কাল সুভাষ বসু হাজিব হবে মনুমেন্টেব তলায।

ট্যাগার্ড সাহেব নির্দেশ দিলো—যে কবেই হোক সুভাষ বসুকে ধবতে হবে। তা সম্ভব না হলে মনুমেন্টেব তলায ঝাণ্ডা তোলা বন্ধ কবতে হবে। পুলিশেব বড কর্তাদেব ট্যাগার্ড সাহেব বিশেষ কবে সাবধান কবে দিল—মাইন্ড ইট, সুভাষ বসু হ্যাজ থ্রোন এ চ্যালেঞ্জ টু দি বৃটিশ গভর্নমেন্ট। মনে বেখো, সুভাষ বসু চ্যালেঞ্জ দিযেছে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে।

কলকাতাব শহব তছনচ কবে দেখলো পুলিশ। সুভাষচন্দ্রেব আত্মীয-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কাবো বাডি বাদ গেলো না। কিন্তু না,—কোথাও পেলো না পুলিশ সুভাষচন্দ্রকে। ২৫শে জানুযাবী পাব হয়ে গেল। পুলিশ এবাব অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ কবলো। ট্যাগার্ড সাহেব হুকুম দিলেন মনুমেন্টেব তলায প্রবেশ কবাব সমস্ত পথ বন্ধ কবে দাও।

২৫শে জানুযাবীব ভোব চললো পুলিশেব প্রস্তুতি। এলো ঘোডসওযাব, এলো বেযনেটধাবী সশস্ত্র ফৌজ,—সঙ্গে এলো শত শত লাঠিযাল লাল পাগডী। ব্যূহ বচনা কবে ঘেবাও কবতে লাগলো পুলিশ মনুমেন্টেব চাবিধাব। প্রথম ব্যূহে ঘোডসওয়াব, পবেব ব্যূহে লাঠিযাল পুলিশ ও তাবপবে উন্মুক্ত বেযনেটসহ ফৌজি পল্টন। এই সব আযোজন কবা হলো সুভাষ বসুব মনে ভয় সৃষ্টি কবাব জন্য। ফৌজি ব্যবস্থাব দাপট দেখে ঝাণ্ডা তোলাব দুঃসাহস যেন না হয সুভাষ বসুব।

সাবা শহবে বটে গেলো ফৌজি ব্যবস্থাব কথা, ভোববাতে দলে দলে লোক জড হলো চৌবঙ্গীব এধাবে ওধাবে। পাঁচজনেব বেশি একত্রে দাঁডাবাব হুকুম নেই। তাই দুজন তিনজন কবে দূবে দূবে দাঁডিযে আছে

কলকাতার উৎসুক জনতা। আর মনুমেন্টের চারিদিকে সারি সারি ফৌজের দিকে চেয়ে ভাবছে—দূর! জেনে শুনে বাঘের মুখে ঝাঁপ দেয় নাকি কেউ! এতো ফৌজি ,—আর মারমুখী ফৌজ, দলে দলে সাদা সার্জেন্ট—কারো সাহস আছে নাকি এদিকে এগোয়।

কিন্তু ট্যাগার্ট সাহেব জানে বাংলার বিপ্লবীদের এই সাহস আছে এবং সুভাষ বসু এই বিপ্লবীদেরই নেতা। পুলিশ তাই ফৌজি বিভীষিকার ব্যবস্থা করেও নিশ্চিন্ত থাকতে পারছে না। সতর্ক ভাবে পুলিশের বড় কর্তারা নজর রাখছে চারদিকে—উত্তরে, দক্ষিণে, পুবে, পশ্চিমে।

কিন্তু পুলিশের বিশ্বাস এমন ভোর রাতে কেউ আসবে না পতাকা তুলতে। হয়তো আসবে সুভাষ বসু বা আর কেউ ভোর বেলায় সূর্য ওঠার পরে। পতাকা হাতে নিয়ে হেটে হেটে আসবে। পুলিশ তখন তাঁকে বা তাঁদের রাস্তা থেকেই গ্রেপ্তার করে তুলে নিয়ে যাবে ভ্যানে করে।

২৬শে জানুয়ারীর সূর্য তখনও উঠেনি। আকাশ ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে। রাস্তার গ্যাস বাতিগুলি ধীরে ধীরে নিবে গেল। অস্পষ্ট আলোয় এগিয়ে আসছে ছাব্বিশে জানুয়ারীর নূতন প্রভাত।

হঠাৎ একটি সার্জেন্ট চিৎকার করে উঠলো-– স্যার! হোয়াটস্ দ্যাট? ওটা কি স্যার? দক্ষিণ-পুব কোণে কি যেন নড়ছে। না স্যার, রাস্তার আলো নয়, সব আলোই নিভে গেছে। গাছের ডালও নয় স্যার,—কে যেন ছুটে আসছে। হ্যাঁ স্যার, আসছে, খুব ছুটে আসছে, বড় সাহেব আর পলকমাত্র বিলম্ব না করে ফৌজি পুলিশকে হুকুম দিলো—'টেনশন'! বি রেডি। হুশিয়ার!

হুকুম শেষ হতে না হতেই দেখা গেল এগিয়ে আসছে একটি অগ্নি-ফলক। যেন ধূমকেতুর মত ছুটে আসছে মনুমেন্টের দিকে। শ্বেত-শুভ্র একটি ভাস্বর-পুরুষ। হাতে ত্রিরঙা ঝাণ্ডা। তীব্রগতিতে ঢেউয়ের মত দুলছে সেই পতাকা—যেন ঝলক দিয়ে উঠছে আকাশের একটি বিদ্যুৎ লহরী। আসছে, আসছে,—হ্যাঁ আরো কাছে আসছে—সোজা তীক্ষ্ণ উন্মুক্ত বর্শা-ফলকের মত এগিয়ে আসছে। আর অবকাশ নেই,—এসে গেলো সেই তীব্রগতি ধূমকেতুটি ফৌজি ঘোড়সওয়ারের কাছাকাছি।

তৎক্ষণাৎ হুকুম দিল বড় সাহেব—চার্জ!

ক্ষিপ্ত ঘোড়সওয়ার ছুটলো ধূমকেতুর দিকে। শুরু হলো ব্যাটন চার্জ। লাঠি বাগিয়ে হামলা শুরু করলো পুলিশ। সঙ্গিন উঁচু করে ধরলো সশস্ত্র ফৌজ।

বড় সাহেব আবার হুকুম দিল—স্ন্যাচ্ দি ফ্ল্যাগ। কেড়ে নাও ঝাণ্ডা!

কিন্তু ততক্ষণে ধূমকেতু ঘোড়সওয়ারের সারি ভেদ করে ঢুকে পড়েছে মনুমেন্টের তলায়। বেসামাল চলেছে পুলিশের লাঠি ব্যাটন ঘোড়সওয়াবের দাপাদাপি।

যেতে যেতে মনুমেন্টের তলায় এসে হঠাৎ থেমে গেল ধূমকেতু। লুটিয়ে পড়ল মাটিতে সেই ভাস্বর পুরুষের দিব্যকান্তি দেহ। কিন্তু বজ্রমুষ্টিতে ধরা রইলো তীক্ষ্ণ সমুন্নত একটি উদ্ধত অগ্নিশিখা—স্বাধীনতাকামী ভারতের অপরাজেয় জাতীয় পতাকা।

চিৎকার করে উঠলো বড় সাহেব—হু ইজ দিস রিবেল—কে এই বিদ্রোহী?

সবিস্ময়ে দেখলো সবাই—এই বিদ্রোহী কলকাতার মেয়র সুভাষচন্দ্র বসু। তখন অচেতন রক্তাক্ত দেহ তাঁর লুটিয়ে পড়েছে মনুমেন্টের তলায়—কিন্তু হাতের বজ্রমুষ্টিতে আবদ্ধ রয়েছে ঊর্ধ্বে উড্ডীন ভারতের জাতীয় পতাকা—সরকারী চ্যালেঞ্জের এক সগর্ব উত্তর।

নিরুদ্ধ আবেগে চৌরঙ্গির আশে পাশে দাঁড়িয়েছিল যে জনতা তারা দেখলো—মনুমেন্টের তলায়—না, ভারতের ভাগ্যাকাশে যেন উঠলো এক নূতন সূর্য! বীর্য-সুন্দর এক অপূর্ব ভাস্কর! বিদ্রোহী ভারতের ভাবী নেতা—নেতাজী সুভাষ চন্দ্র!

[মাঘ, ১৩৬৭]

# গৌরব

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ক্লাস ফাইভে মাস্টারমশাই ইতিহাস পড়াচ্ছেন। আর্যেরা কিভাবে এদেশে এলেন সেই কাহিনী। সামনের বেঞ্চের ছেলেরা খুব মন দিয়ে শুনছে। কত পাহাড়-পর্বত, নদী আর সমুদ্র ডিঙিয়ে আর্যেরা এদেশে এলেন। একের পর এক দেশ জয় করলেন। অনার্যদের চাকর বানিয়ে রাখলেন—নাম দিলেন শূদ্র।

সব ছেলে মন দিয়ে শুনছে। পিছন দিক থেকে গোলমাল হচ্ছে একটু একটু। ইতিহাসের মাস্টারমশাই বিরাট এক ধমক দিলেন ঃ এই চুপ! কে গোলমাল করছে ক্লাসে?—কে কে গোলমাল করছে ক্লাসে?

ক্লাস আবার নিঃশব্দ।

মাস্টারমশাই আবার পড়াতে শুরু করলেন।

আর্যেরা দেখতে ছিলেন সুপুরুষ দীর্ঘ চেহারা, গায়ের রঙ ছিল উজ্জ্বল গৌর। তাঁরা কৃষিকাজ জানতেন—রন্ধনবিদ্যা জানতেন। ফের গোলমাল? আমি কিন্তু এবার তোদের কাঁচাই খেয়ে ফেলব।

ছেলেরা সভয়ে চুপ করল। ইতিহাসের মাস্টারমশাইর চেহারা আর্যদের মত নয়। বেঁটে খাঁটো চেহারা; দেখতে খুব কালো আর মোটা। মাথাজোড়া টাক। কিন্তু পুলিসের দারোগার মত লম্বা পুরু একজোড়া গোঁফ।

ধমক খেয়ে ছেলেরা ভয় পেয়ে চুপ করে গেল।

কিন্তু সবচেয়ে পিছনে যারা বসেছে সেই টিন্টু আর রতনের যেন ভয়ও নেই, লজ্জাও নেই। মাস্টারমশাই ফের পড়াতে শুরু করবার সঙ্গে সঙ্গে তারা ফের গল্প জুড়ে দিল।

টিন্টু বলল ঃ জানিস রাঙা কাকা কত বড় একজন ইঞ্জিনীয়ার? কত বড় বড় বাড়ি করেছেন! কত বড় বড় ব্রীজ করেছেন। সেই ব্রীজের ওপর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু হেঁটে পার হয়ে গেছেন জানিস?

রতন বলল ঃ কিন্তু আমার ছোটমামা যে কত বড় গায়ক তুই জানিসনে! রেডিওতে তাঁর গান হয়। মাসে একবার করে সেখানকার লোকেরা তাঁকে আদর করে ডেকে নিয়ে যায়। তাছাড়া অগুণতি রেকর্ড আছে তাঁর। ঘরে ঘরে সবাই বাজায়। আর জলসা ফলসা থেকে কত যে তাঁর ডাক আসে তোকে কী বলব?

টিন্টু ফের তার ইঞ্জিনীয়ার কাকার গর্ব করতে যাচ্ছিল। কিন্তু কিছুই বলা হলোনা। তার আগেই ইতিহাসের সতীশবাবু এসে দুহাতে দুজনের দুটি কান টেনে ধরলেন। ওঠো, ওঠো, দাঁড়াও বেঞ্চের ওপর।

টিন্টু আর রতন দুজনেই উঠে দাঁড়াল।

মিনিট দশেক পরে ইতিহাসের ঘন্টা শেষ হল। আর্যদের উপনিবেশ স্থাপন পর্যন্ত পড়িয়ে মাস্টারমশাই থামলেন। ছেলে দুটির দিকে তাকিয়ে এবার বোধহয় তাঁর মনে একটু মায়া হল। বললেন ঃ নেমে আয় এদিকে।

টিন্টু আর রতন মাস্টারমশাইয়ের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। ভাবল আরো না জানি কী শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু আশ্চর্য, মাস্টারমশাই হাসলেন। অনার্যদের মতই মাস্টারমশাইয়ের চেহারা। দাঁতগুলিও উঁচু নিচু, ফাঁক ফাঁক। তবু তাঁর হাসি টিন্টু আর রতনের কী ভালই না লাগল!

মাস্টারমশাই এবার হেসে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তখন কি নিয়ে গল্প করছিলিরে তোরা?

টিন্টু বলল ঃ সত্যি কথা বলব স্যার?

মাস্টারমশাই বললেন ঃ নিশ্চয়ই। সত্যি না কি মিথ্যে বলবি বানিয়ে বানিয়ে? গুরুজনদের কাছে তা' কখনো বলে?

টিন্টু বলল ঃ আমি আমার রাঙা কাকার কথা বলছিলাম। তিনি মস্ত বড় একজন ইঞ্জিনীয়ার।

রতন বলল ঃ আমি বলছিলাম আমার ছোটমামার কথা। তিনি খুব নামকরা গায়ক। কত যে রেকর্ড আছে তাঁর।

মাস্টারমশাই দুজনের নাম জেনে নিলেন। তারপর হেসে বললেন ঃ একজনের কাকার আর একজনের মামার। কিন্তু শুধু ওদের নিয়ে গর্ব করলে হবে না। তোমাদেরও বড় হওয়া চাই। মানুষ হওয়া চাই। যাতে তোমাদের বাপ-জ্যাঠা-কাকারা তোমাদের নিয়ে গর্ব করতে পারেন।

দুজনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে মাস্টারমশাই চলে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে টিফিনের ঘণ্টা পড়ল।

সবাইকে এড়িয়ে টিন্টু আর রতন বেরিয়ে এল। গেটের সামনে চিনে বাদামওয়ালা বসেছে। তার কাছে থেকে বাদাম কিনল। আরো অনেক ছেলেই বাদাম কিনছে, কুড়মুড় ভাজা কিনছে। শশা আর পেয়ারা কিনছে কেউ কেউ।

কম্পাউন্ডের বাইরে যেতে মানা। টিন্টু আর রতন চিনেবাদাম ছাড়াতে ছাড়াতে দেয়ালের কাছে এল। কাঁটা তারের ফাঁক দিয়ে ওপাশে পার্ক দেখা যাচ্ছে। সবুজ গাছের সারি আর জলভরা পুকুর।



সেদিকে তাকিয়ে টিন্টু বলল ঃ আচ্ছা, মজাটা কি রকম হয়রে?

রতন বলল ঃ কিসের মজা?

টিন্টু বলল ঃ ধর সত্যিই যদি আমাদের বাবা, জ্যাঠামণি, কাকা আর মামাদের নিয়ে একটা ক্লাস বসে, তাহলে বেশ হয় —না?

রতন বলল ঃ তাহলে ওঁদের মাস্টারমশাই নিশ্চয় আমাদের দাদুর মত বুড়ো থুড়থুড়ে হবেন। দাদুর বয়স কত জানিস? আশি বছর।

টিন্টু বলল ঃ আমার তো দাদু নেই। তোর দাদুই না হয় আমাদের সবাইর বাবা কাকার ইতিহাসের সতীশ বাবু হয়ে এলেন। তারপর তোর বাবা আর আমার বাবা পিছনের বেঞ্চে বসে ইতিহাসের পড়া না শুনে...

রতন টিন্টুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল ঃ আমাদের নিয়ে গল্প করতে লাগেন। বেশ হয়, খুব মজা হয়। কিন্তু কী নিয়ে ওরা গর্ব করবেন বলতো। আমরা তো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ কিছুই হতে পারিনে, কোনরকমে পাশ করে উঠি।

টিন্টু বলল ঃ আমরাও ফার্স্ট সেকেন্ড হব।

রতন বলল ঃ যখন হব তখন হব। ধর, কালই যদি বাবা কাকাদের নিয়ে সেই মজার ক্লাসটা বসে—।

টিন্টু বলল ঃ যদি বসেই, আমাদের নিয়ে কিছুই বুঝি ওঁরা গর্ব করতে পারবেন না? তোর বাবা বলবেন, আমার রতন এবার হাইজাম্পে ডি গ্রুপের মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে।

রতন বলল ঃ আর তোর বাবা বলবেন আমার টিন্টু রেসে ডি আর সি গ্রুপের মধ্যেই ফার্স্ট। দু'জন হেসে দুজনের দিকে তাকাল। রতনের বাদাম ফুরিয়ে গিয়েছিল। টিন্টু নিজের পকেট থেকে তাকে আরও কটা বাদাম দিল।

রতন বলল ঃ আমাকে সব দিয়ে দিচ্ছিস কেন? তুই খা না।

টিন্টু বলল ঃ খাচ্ছি। তুই খা ও-কটা।

রতন শেষ চিনেবাদাম কটা ছাড়িয়ে মুখে দিতে দিতে বলল ঃ তারপর তোর বাবা আমার বাবাকে বলবেন, আপনার ছেলে আর আমার ছেলের দুজনে খুব বন্ধুত্ব নারে?

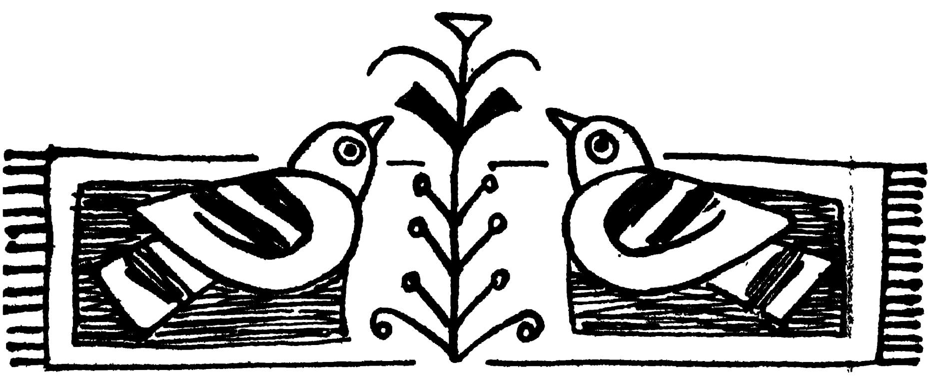
টিন্টু লজ্জিত হয়ে বলল ঃ দূর তাই আবার কেউ বলে না কি? বাবা আমাদের বন্ধুত্বের কথা কিছু বোঝেন?

রতন বলল ঃ বাঃ রে, বুঝবে না কেন? আমার বাবা তো প্রায়ই তোর কথা জিজ্ঞেস করেন। তুই যদি দুদিন না যাস আমার বাবা তোর খোঁজ নেন। বলেন, আলাদা আলাদা যাসনে একসঙ্গে স্কুলে যাবি।

টিন্টু এগিয়ে এসে রতনের কাঁধের ওপর হাত দিয়ে হেসে বলল ঃ আমার বাবাও ঠিক ওই কথা বলেন, জানিস?

ঘুরে ঘুরে টিফিনের সময়টা শেষ করে টিন্টু আর রতন ফের তাদের ক্লাসরুমের দিকে এগোতে লাগল। ফের বাবাদের নিয়ে সেই মজার ক্লাসের কথা উঠল। ওঁদের নিয়ে ক্লাস হলে দুই বাবা পিছনের বেঞ্চে বসে টিন্টু আর রতনের স্কুলে যাওয়া, একসঙ্গে খেলাধূলা করা, সব ব্যাপারে তাদের বন্ধুত্বের গল্পই যে করবেন তা নিয়ে ওদের মধ্যে আর কোন মতভেদই থাকে না।

[ফাল্গুন, ১৩৬৭]



# কবির জন্মদিন ও তরুণ যাত্রীদল

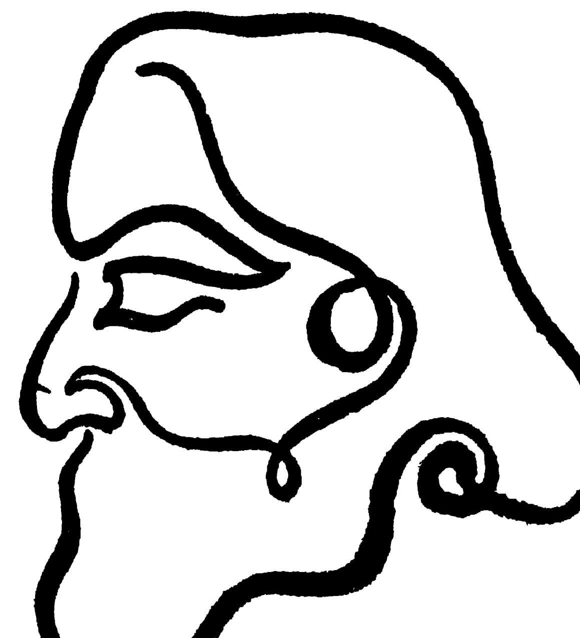
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা দেশের ছেলেমেয়েরা বাংলা দেশের মাটির গুণ জানে না, বাংলা দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে তারা আদবেই ওয়াকিবহাল নয়।

বাংলা দেশের মাটি পাথুরে মাটি নয় এ মাটি বহু মানব স্রোত পলিপড়া মাটি; বিপ্লবেব মাটি। এখানে গলা ধাতুর মতো ফুটন্ত স্রোতে বয়ে গেছে মানব-স্রোত, চিন্তার স্রোত, কর্মের স্রোত। বাংলা দেশের ইতিহাস প্রবহমান স্রোতের ইতিহাস, জীবনের সর্বক্ষেত্রে দুঃসাহসিকতার ইতিহাস, নব নব সৃষ্টির ইতিহাস।

এই চলমান সৃষ্টিশীল বাংলার প্রাণের সুরেব সঙ্গে সর্বদেশের চলমান মানব ধারাব সুবের মিল ছিল। সেই মিলনটিকে আমাদের চোখের সামনে আশ্চর্য রূপ দিয়ে ধরে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ চলাব কবি, স্থাণুর তিনি চির-শত্রু। চলার জয়গানে তাঁর কাব্য মুখর, বিশেষ করে 'বলাকা'র কবিতাগুলি। যৌবনের জয়গান তিনি করেছেন 'বলাকায়'। এই যৌবন চলারই অপর নাম। সুখের খাঁচায় বসে ঝিমুতে বারণ করেছেন কবি। শিকল—দেবীর পূজাবেদীটাকে পদাঘাতে চূর্ণ করে এগিয়ে যাবার ডাক দিয়েছেন তিনি। চলার গান গাইবার জন্যে তিনি আহ্বান কবেছেন। ডাক দিয়ে বলেছেন—

যাত্রা কর, যাত্রা কর যাত্রীদল,
উঠেছে আদেশ,
বন্দরের কাল হল শেষ।।



এই চলার সবই হল রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ও জীবনের মূল সুর। আজ বাংলা দেশের ছেলেমেয়েবা এই চলাব সুর ভুলতে বসেছে। ছোট ছোট লোভের বেড়াব মধ্যে তারা স্থাণু হয়ে বসেছে, লোভের আবিলতায় প্রাণকে অশুচি করেছে। তাই বাংলায় আজ আর পথিক নেই, আছে পাটোয়ারী বুদ্ধির তরুণেরা। তাই বাংলার এই দুর্দশা। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই বিদ্রোহ নেই। তাই বাংলা আজ মরতে বসেছে।

দলে দলে বিদ্রোহ আসুক, আসুক বিপ্লবী নবজীবনের যাত্রার পথে; তবেই তো বাংলা বাঁচবে। নবজীবনের বন্ধুর পথের যাত্রীরা কিন্তু তখনই সব বাধা অতিক্রম করে সব কাঁটা মাড়িয়ে চলতে পারবে, যখন তারা বিশ্বের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হবে। বাংলার তরুণ যাত্রীদের বিশ্বপথের যাত্রী হতে হবে। নইলে তার যাত্রা বিফল হবে; ছোট গণ্ডীর মধ্যে ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে মরতে হবে।

কেন এই যাত্রা? বর্তমান পৃথিবীর রূপ কি? এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কত কথাই না বলে গেছেন! বর্তমান পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন : ভরা ক্ষেতে বাস করিছে উপবাস। বলেছেন : আজকাল চলছে না কিছু, সব ধনপতিরই হাতে চলছে। বজ্রস্বরে তিনি বলেছেন—

"ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন।।"

ভূরিভোজীদের এই সমাজ ব্যবস্থা কি চিরন্তন হবে? না, কখনই না। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—

সবে না দেবতা হেন অপমান
এই ফাঁকি ভক্তির।
যদি এ ভুবনে থাকে আজো তোর
কল্যাণ শক্তির।
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে।

বিশ্ববাসীকে রবীন্দ্রনাথ ডাক দিয়ে বলেছেন—

দামামা ঐ বাজে
দিন বদলের পালা এল
ঝোড়ো যুগের মাঝে।
পালিশ করা জীর্ণতাকে চিনতে হবে আজি।
দামামা তাই ঐ উঠেছে বাজি।"

বেনের যুগ ভূরিভোজীদের যুগ শেষ হয়ে এসেছে। যুগের ঈশান কোণে বিপ্লবের মেঘ এসেছে ঘনিয়ে; দামামা বেজে উঠেছে; তৈরী হও তরুণের দল, নবজীবনের যাত্রীদের উদ্দেশ্যে এই হল রবীন্দ্রনাথের ডাক।

বাংলার সেই তরুণ যাত্রীরা কোথায়? সুবিধাবাদ ও ভীরুতার পংকে জীবন তাদের বন্দী। যে শক্তি দিয়ে, নিঃস্বার্থতা দিয়ে নূতন যুগ সৃষ্টি করতে হয়, সে শক্তি সে নিষ্কাম বীর্য আজ কোথায়?

রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথিতে এই কথাগুলি মনে রেখে বাংলাব তরুণদল যদি যাত্রা শুরু করে নবজীবনের পথে, ভয়কে যদি উপহাস করে, লোভকে যদি পদাঘাত করে, ভূরিভোজীদের বীভৎস পালা শেষ করে দেবার জন্যে যদি তারা দলে দলে এগিয়ে আসে, তবেই তাদের চলা হবে সার্থক, জীবন হবে ধন্য বাংলা বাঁচবে, বাঁচবে ভারতবর্ষ।

[বৈশাখ, ১৩৬৮]



# কবি পরিক্রমা

### শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

তখন কতই বা আমার বয়স! আট দশ বছরের ইস্কুলের ছাত্র।

গরমের ছুটিতে বোলপুরে গেছি। সেখান থেকে যাব হাট-সেরানডি। অনেকখানি পথ। গরুর গাড়ীতে যেতে হয়।

কিন্তু মুস্কিল হলো এই যে, একখানা মাত্র গাড়ী নিয়ে একা একজন গাডোয়ান ও-রাস্তায় কিছুতেই যেতে চায় না। পথটা শুধু দূর নয়, দুর্গমও বটে। দুর্গম—চোর ডাকাতের ভয়ে নয়। ভয়—কাদাব। পথের মাঝে মাঝে এমন কাদা যে গ্রীষ্মের খর রৌদ্রেও সে-কাদা শুকোয় না। আরও ঘন, আরও জমাট হয়ে ওঠে। সেই কাদার গর্তে গাড়ীর চাকা একবার যদি পড়ে তো আব বক্ষা নাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মানুষে আর গরুতে চলে শক্তি পরীক্ষা। কাজেই অনেকগুলি গাড়ী যতক্ষণ না জোটে, ততক্ষণ থাকো বোলপুরে বসে।

মহাভারতে পড়েছিলাম, কর্ণের রথচক্র মেদিনী গ্রাস করেছিল। তখন তার মানেটা ঠিক বুঝতে পারিনি। কিন্তু বোলপুর থেকে হাট-সেরানডি যাবার পথে হঠাৎ একবার মনে হয়েছিল—কর্ণের রথ বুঝি এই রাস্তাতেই চলেছিল।

সে যাই হোক, সে আজ অনেক দিনেব কথা।

এখন শুনছি নাকি সেই রাস্তার উপব দিয়ে মোটর গাড়ী চলছে, বাস চলছে যাত্রী নিয়ে। সে রাস্তাও আর নেই, সে কাদার কথাও মানুষ ভুলে গেছে।

যেমন ভুলেছে বোলপুরের ভুবনডাঙ্গার কথা।

বোলপুর অনেকবার গেছি। কিন্তু সেই প্রথমবারের কথাটাই বলি।

বোলপুর থেকে হাট-সেরানডি যাব বলে গরুর গাড়ীর 'কনভয়ে'র জন্য অপেক্ষা করছি, একদিন বিকেলে দুগগা মামা বললে, "চল তোকে ভুবনডাঙ্গা দেখিয়ে আনি।"

—"সে আবার কি?"

দুগগা-মামা বললে, "রবি ঠাকুরের ব্রহ্মচর্যাশ্রম।"

শান্তিনিকেতনের এই নামই ছিল তখন।

রবি ঠাকুর! —এই নামটির সঙ্গে তখন আমার পরিচয় হয়েছে। পরিচয় হয়েছে ইস্কুলের হেড পণ্ডিত মশাই-এর কল্যাণে। এই নামটিকে কিছুতেই তিনি সহ্য করতে পারতেন না! আমাদের পাঠ্য পুস্তকে ছিল "গীতাঞ্জলি রচনা করিয়া শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন।"

পণ্ডিত মশাই বলতেন, "ঘোড়ার ডিম পাইয়াছেন।"

ক্লাসে বসেই তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-নামিত এই কবি সম্বন্ধে যা তা বলতেন। কি বলতেন সে-সব কথা আজ আর আমার মনে নেই। শুধু মনে আছে কথায় কথায় বলতেন, বড় লোকের ছেলে—মেলা টাকা। টাকার জোরে সবই হয়!

সেই অতিনিন্দিত বড়লোকের ছেলেটির ব্রহ্মচর্যাশ্রম দেখতে গেলাম।

ভুবন ডাঙ্গার মাঠ!

লোকালয় থেকে দূরে কাঁকর-পাথরের ডাঙ্গা পেরিয়ে সমতল একটা মাঠের উপর শাল, তাল আর তমাল গাছের ছায়া ঘেরা মুনিঋষির তপোবনের মত বড় সুন্দর একটি জায়গা। মাটির কয়েকটি ছোট বড় নানা রকমের ঘর। কোনটি বা খড়ের, কোনটি বা টিনের। ইঁটের তৈরী ছাতিমতলার বেদী আর উপাসনা মন্দির। কেমন যেন শ্যামসুন্দর পরিবেশ। জানা-অজানা কত রকম কত পাখির ডাক। আর মৌমাছির আওয়াজ!

কিন্তু তিনি কোথায়?

যাঁকে দেখতে এলাম কই তাঁকে তো দেখছি না!

দুগগা-মামা কাকে যেন জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলে—রবীন্দ্রনাথ এখানে নেই। কাল সকালে আসবেন কলকাতা থেকে।

আসতে ইচ্ছা করছিল না, তবু সেদিন চলে আসতে হলো।

পরের দিন সকালে কাউকে কিছু না জানিয়ে একাই চলে গেলাম বোলপুর স্টেসনে।

কলকাতার ট্রেন এল ঘণ্টাখানেক পরে। কাউকে চিনিয়ে দিতে হলো না। ট্রেন থেকে নামলেন সৌম্য সুন্দর সেই শুচিশুভ্র মানুষটি। চুলদাড়ি তখনও কাঁচা।

ইনিই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর?

আশ্রম থেকে একটি ঘোড়ার গাড়ী এসেছিল। তাইতে তিনি উঠে বসলেন। গাড়ী ছেড়ে দিলে। রাস্তার রাঙা ধূলো উড়িয়ে গাড়ী চলে গেল ভুবনডাঙ্গার দিকে।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম।

দেখার সাধ কিন্তু মেটেনি।

আবার গেলাম ভুবনডাঙ্গায়।

এবার গেলাম কাউকে সঙ্গে না নিয়ে। একা।

সে ছবিটি আমার এখনও মনে আছে। পশ্চিম দিগন্তে সূর্যাস্ত হচ্ছে। এদিকে আকাশে একফালি চাঁদও উঠেছে। মিষ্টি মিষ্টি হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো কাঁপছে ঝির ঝির করে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, হঠাৎ দেখি সেই আজানুলম্বিত বাহু সেই দীর্ঘায়ত দেহধারী ঋষিকল্প কবি রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে আসছেন গাছের ফাঁকে ফাঁকে। সঙ্গে কয়েকজন ছেলেমেয়ে। কারও পায়ে জুতো নেই।

ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া পাতাওলা একটা গাছের নীচে ইঁট দিয়ে বাঁধানো ধাবির ওপর বসলেন রবীন্দ্রনাথ। ছেলেমেয়েরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কি যেন বলতে লাগলো।

বাল্মীকির তপোবনের একটি ছবি আঁকা ছিল আমার মনে। ভারতবর্ষের প্রাচীনকালের সেই তপোবনের সঙ্গে এর যেন মিল ছিল।

রবীন্দ্রনাথকে সেই আমার প্রথম দেখা।

কাছে যাবার সাহস ছিল না। তাই দূর থেকে দেখেই নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম।

কিন্তু কি বিচিত্র মানুষের জীবন।

কে জানতো বড় হয়ে আমি লেখক হব। কে জানতো সেই লেখা পড়ে খুশি হয়ে রবীন্দ্রনাথ আমার সম্বন্ধে লিখবেন, আমাকে ডেকে পাঠাবেন তাঁর স্নেহচ্ছায়াতলে, কে জানতো তাঁর অমৃতময় উপদেশ লাভ করে আমি ধন্য হব।

ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁর সঙ্গে পরিচয় যখন আমার ঘনিষ্ঠ হলো তখন আমি কতটুকুই-বা লিখেছি! কীই-বা লিখেছি!

জীবনকে জানবার, জীবনকে দেখবার আগ্রহটুকু ছিল অপরিসীম, কিন্তু আমার জীবনবোধ তখনও বিকশিত হয়নি। সত্যদ্রষ্টা সেই ঋষিকবি, সেই মহাতাপস রবীন্দ্রনাথ হলেন আমার পথপ্রদর্শক।

রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, এইটিই আমাদের পরমতম সৌভাগ্য। তার চেয়েও আমার বড় সৌভাগ্য তাঁর অযাচিত স্নেহ আর আশীর্বাদ!

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার এই পরিচয়ের সূত্র ধরে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগের কয়েকটি দিনের স্মৃতিকে খুব ফলাও করে লিখে সেটাকে ঘনিষ্ঠতা বলে প্রচার করে মিথ্যা আত্মপ্রসাদ লাভ চাই না। কারণ আমি জানি—এমন অনেকে আছেন যাঁরা ছিলেন তাঁর নিত্য সহচর, একান্ত অন্তরঙ্গ। দেবতার বিগ্রহমূর্তিকে মানুষ যেমন করে পূজা নিবেদন করে, তেমনি করে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বা তার অন্তরের ভক্তি-অর্ঘ্য নিত্য নিবেদন করেছেন কবির ব্যক্তি পুরুষকে; আবার কেউ কেউ বা তাঁর ব্যবহারিক জীবনের সুখ-দুঃখের হয়েছেন অংশীদার। এমনি করেই এসেছে তাঁদের জীবনের চরিতার্থতা।

আমি কিন্তু সে-দলের নই। সে সৌভাগ্য আমাব হয়নি।

কবির আহ্বান যখন এলো আমাব কাছে, এলো একেবারে অকস্মাৎ এক অচিন্ত্যপূর্ব বিস্ময়ের মত। একেবারে দিশেহারা হয়ে গেলাম আমার সেই পরমতম সৌভাগ্যে। তখন আমার সাহিত্য জীবনের শৈশবকাল মনে হয় যেন সবেমাত্র উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি। বিধাতার সৃষ্টিবৈচিত্র্যে বিমুগ্ধ দুই চোখে তখন স্বপ্নের অঞ্জন, আর মনের মধ্যে অনন্ত জিজ্ঞাসা।

সেই জীবন-জিজ্ঞাসাব জবাব পাবার আশা নিয়েই আমি গিয়েছিলাম তাঁর কাছে। জবাব অবশ্য হাতে-হাতে পাইনি। পাওয়া সম্ভব নয় জানতাম। কিন্তু তাঁর স্নেহাশীর্বাদধন্য আমাব জীবনের সেই পরম মুহূর্তটি আজও মনে হয় যেন বিধিনির্দিষ্ট। কাবণ তারপর থেকেই আমার জীবনে শুরু হলো রবি প্রদক্ষিণ। রবীন্দ্র-সাহিত্য চর্চা।

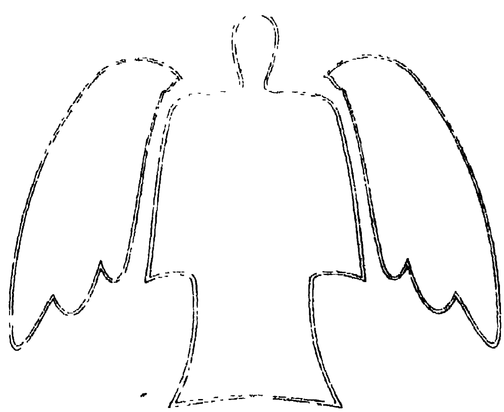
এতদিন পরে আরম্ভ হলো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাব সত্যকার পরিচয়।

সে পরিচয় আমার আজও শেষ হয়নি। কোনোদিন শেষ হবে বলে মনেও হয় না।

চুম্বকেব মত অত্যাশ্চর্য আকর্ষণী শক্তি এই ববিকক্ষপথের। একবার যদি আমার মত কোনও উপগ্রহ সেই কক্ষপথে গিয়ে পড়ে তো তাব রবীন্দ্র পরিক্রমার শেষ হবে না কোনদিন। রবীন্দ্র প্রতিভার অম্লান জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে তাব সমস্ত জীবন। জীবন জিজ্ঞাসাব হবে পবিসমাপ্তি। জীবনবোধ হবে চিরন্তন সত্যে প্রতিষ্ঠিত। জীবন যাত্রা হবে মধুময়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পবিচয় তখনই হবে অন্তরঙ্গ, তখনই হবে ঘনিষ্ঠ।

[ বৈশাখ, ১৩৬৮]



# চলো আবার গাঁয়েই ফিরে চলো

আবুলকাশেম রহিমউদ্দীন

মাগো আমার, এ-কোন্ দেশে এলে?
এমন দেশে কেমন করে রই!
দিনের শেষে সূর্য নেমে গেলে—
ধানের ক্ষেতে বাতাস নাচে কই?

এই কি মাগো শহর কলিকাতা—
আকাশময় মাকড়শার জাল,
নীচে অনেক পাথুরে পথ পাতা—
পথের ভীড় বেঘোর-বেসামাল।
চলতে গেলে হারিয়ে যেতে হয়,
হাজার পথে হই-যে দিশেহারা!
এ-দেশে কেউ আমার চেনা নয়—
আমার ডাকে দেয় না তো কেউ সাড়া!

বিভূঁই দেশে খেলার সাথী কই,
এমন দেশে মাগো আমার মা'
সঙ্গীছাড়া কেমনে আজ রই!

এখানে যারা পাথরে মাথা কোটে,
তাদের কাছে দুহাত কেন পাতো!
পেটে আগুন দ্বিগুণ জ্বলে ওঠে—
এ-ফুটপাথে উনোন জ্বলে না তো!
শহর ভরা কতই কোঠাবাড়ি,
কোথাও তবু ঠাঁই কেন মা নেই?
শহর জুড়ে চলছে কাড়াকাড়ি—
স্বস্তি তো কেউ পায় না কিছুতেই।

পুকুর-মাঠ, নদীর ঘাট ফেলে,
আমায় নিয়ে মাগো আমার মা
কেন এমন অবাক দেশে এলে?

মাগো আমার মুখের পানে চেয়ে
কেন তোমার দুচোখ ছলোছলো!
কি হবে আর চোখের জলে নেয়ে,
চলো আবার গাঁয়েই ফিরে চলো।।

# আয়রে

নির্মলেন্দু গৌতম

সজ্‌নে শাখায় দোল্‌না বেঁধে
দুল্‌বো না হয় খানিক ঃ
আয়রে আমার শালিকছানা,
আয়রে আমার মানিক!

বন্ধু যারা, ডাকনা তাদের
সজ্‌নে গাছের শাখায়!
রান্না করে খাইয়ে দেবো
বন্ধুরা তোর যা খায়!

ভয়টা কিসের? পড়তে দেবো?
আচ্ছা দেখি পাগল!
এই চেয়ে দেখ, পড়ার ঘরে
দিচ্ছি তুলে আগল!

দেবোই না হয় বন্ধুরা তোর
খেলাঘরের যা নিক্!
দোল্‌না বেঁধে দুল্‌বো শুধু
আয়নারে তুই মানিক!!

[মাঘ, ১৩৬৭]

# কপিলদেও

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ফুটবল ম্যাচ খেলতে চলেছি। একজন extra নিয়ে বারো জন প্লেয়ার, একটা চাকর আর দুজন শিক্ষক—আমাদের গেম টিচার সেকেন্ড মাস্টার মশায় আর হেড পণ্ডিত বজরং চৌধুরি।

আমরা হেড মাস্টার মশায়কে বললাম, 'আরও কয়েকজন ছেলেকে যেতে দিন স্যার, কম্‌পিটিশান ম্যাচ কিনা।'



অনেক দিন আগেকার কথা হচ্ছে, সে সময় কম্‌পিটিশান ম্যাচ মানেই ছিলো মাথা ফাটাফাটি। আমাদের ক্যাপ্টেন দংগী সিং মাঠে নামবার আগেই সবাইকে মনে করিয়ে দিত, 'দেখো ভাই, এক রোজ মরণা হি হ্যায়।' কম্‌পিটিশান ম্যাচ মাত্রই সে হলদিঘাটের যুদ্ধ বলে ধরে নিত।

সেকেন্ড মাস্টার বললেন, 'তোমরা হলেও তো প্রায় কুড়ি বাইশ জন বাপু, আর দুঃখু কিসের?'

হেড মাস্টার মশায় হেসে প্রশ্ন করলেন, 'কপিলদেওকেই গোলে দেওয়া ঠিক করলেন নাকি?'

একা কপিলদেওকে পাঁচ-ছজনের সামিল ধরে নেবার একটা রেওয়াজ স্কুলে আছে।

সেকেন্ড মাস্টার বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের হিমাংশু যতক্ষণে ক্যালকেশিয়ান স্টাইল দেখাবে ও ততক্ষণে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু হাতটা বাড়িয়েই বল রুখে দেবে। আর সঙ্গে ওরকম একটা অসুর থাকাও ভালো—বিদেশ বিভুঁই... হিমাংশুকে অবশ্য নিয়ে যাচ্ছি extra করে।'

কপিলদেওকে বর্ণনা করবার চেষ্টা করব না, কেননা এ সৌখীন যুগের হালকা ফিনফিনে ভাষায় ওর চেহারার মর্যাদা রাখা যায় না। কপিলকে দেখে আমার কেমন যেন মনে হতো—আগামী সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের জন্য বিশ্বকর্মা যে সব অতিকায়দের সৃষ্টি করছেন, তাদেরই ভেতর থেকে একজন যেন পথ ভুলে এ-যুগে নেমে পড়েছে—আগামী যুগের ভীম, ঘটোৎকচ, অশ্বত্থামা—এই রকম একজন কেউ। ঠিক ঐ জিনিস, তবে এ-যুগের জলহাওয়ার দোষে পরিমাণটা ঠিক ওদের মতো হতে পারে নি। পড়ার সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, প্রমোশন

বিষয়ে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ সে। তিন-চাব বছব অন্তব চক্ষুলজ্জাব খাতিবে তাকে এক একবাব উচ্চতব ক্লাসে তুলে দেওয়া হতো। কাজেই, একদিন স্কুল থাকবে অথচ কপিলদেও থাকবে না—এ কথা কেউ কল্পনাও কবতে পাবে না।

গাড়ি থেকে সদলবলে স্টেশনে নেমে প্ল্যাটফর্মেব বাইরে আসতেই ঝাঁকে ঝাঁকে হোটেলওয়ালা আমাদেব ঘিবে ফেলল, টানাটানি লাগিয়ে দিল।

একটু মাংস পেটে পডা দবকাব—কম্‌পিটিশান ম্যাচ কিনা, তাই এক মাংসেব হোটেলে আশ্রয় কবাই স্থিব হলো।

হোটেলওয়ালাব নাম দুখ হবণ মিশিব। সে সাদবে একটা ঘবে আমাদেব জাযগা কবে দিল।

সেকেন্ড মাস্টাব বললেন, 'তোমবা সবাই ঠিক আছ তো? কপিলদেও কোথায?'

'তাইতো!'—বলে সামনে চাইতেই দেখি, খানিকটা দূবে বাঁ কাঁকালে একটা বেশ ওজন দুবস্ত কাঁটাল নিয়ে নতুন নাগবা পায অল্প অল্প খোঁড়াতে খোঁড়াতে কপিলদেও আসছে। আমাদেব চেয়ে থাকতে দেখে দূব থেকেই সে হাসিমুখে জানাল, 'ইহাঁকা কট্‌হব বডা সস্তা হ্যায।'

এক সময হোটেলওয়ালা ওদিককাব বন্দোবস্ত তদাবক কবে, আমাদেব সুখ সুবিধেব খোঁজ নিতে গিয়ে, দু একটা কথা বিনযেব হাস্যেব সঙ্গে বলতেই হঠাৎ দবজাব বাইবে কপিলেব নাগবাব ওপব নজব পড়ে একেবাবে যেন পাথবেব মত নিশ্চল হযে গেল। খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে প্রশ্ন কবল, ' এ জুতো কি আপনাদেব দলেব মধ্যে কাকব?'

দংগী ক্যাপ্টেন সুলভ গর্বেব সঙ্গে বলল, 'হামাবা গোল কীপাবকা হ্যায জী।' সঙ্গে সঙ্গে আমবা ইসাবা কবে তাকে থামাবাব আগেই ডাক দিল, 'কপিলদেও।

ঘবেব ও কোনটায একটা ঢেঁকি যেন আধদাঁড়া হয়ে উঠল। খস্‌খসে আওযাজে উত্তব এল, 'ক্যা, ক্যাপ্টেন সাহাব।' লোকটা ভীত বিস্ময়ে মূর্তিটাব পানে চেয়ে বইল একটু তাবপব মুখটি অন্ধকাব কবে ধীবে ধীবে চলে গেল।

খানিক পবে আবাব সে এল তাব হাতজোড কবে জানালে যে, লোক পাঠিযেছিল বাজাবে, কিন্তু বাজাবে পাঁঠাই পাওযা গেল না। আমাদেব খাওযাতে সে অক্ষম।

ব্যাপাবটা সকলেই বুঝলাম—কপিলদেও বেচাবীকে ভড়্‌কে দিয়েছে।

বেলা তখন প্রায ন'টা। সেকেন্ড মাস্টাব চিন্তিতভাবে সবাব দিকে চেযে প্রশ্ন কবলেন, 'উপায এখন তাহলে?'

আমাদেব অগত্যা পাততাড়ি গুটিযে বাস্তায নামতে হলো। সাবডিভিশান টাউন, ততক্ষণে মুখে মুখে খববটা বেশ চাবিয়ে গেছে। একটা ছোট খাটো গোছেব ভীডও আমাদেব সঙ্গী হযেছে— বিশেষ কবে কপিলদেওব চাবদিকে। আমবা যে হোটেলেই যাই—কোন না কোন ছুতা কবে বিদায কবে দিচ্ছে। এইভাবে ছ সাতটা হোটেল ঘুবে শেষে একটা হোটেল বাজি হলো। কিন্তু এক সর্তে যে, কপিলদেও তক্ষুণি তাব ঐ বিবাট কাঁটালটা খেযে নেবে, তাবপব ভাত ডাল-তবকাবি বান্না হলে সকলেব সঙ্গে খেতে বসবে। অনেক কষ্টে সকলেব উপবাসেব সম্ভাবনা দেখিয়ে তাকে বাজি কবানো হলো।

ঘণ্টা দেডেকেব মধ্যে অর্থাৎ বাবোটাব কাছাকাছি বান্না শেষ হলে খেতে বসলাম সবাই।

আহাবার্থীদেব অবস্থা উদাবক ও মানসিকতাব আব বর্ণনা দিলাম না। তবে কপিলদেওব সম্বন্ধে একটা সন্দেহ থেকে গেল। মাত্র ঘণ্টা দেডেক আগেই যে একটা আস্ত কাঁটাল খেল খেতে বসে সে তাব মামুলি খাওযাই খেল, না আক্রোশেব বশে বেশী বেশীই খেল, বলতে পাবি না। তবে হোটেলওয়ালা শেষ পর্যন্ত জোগান দিতে পাবল না। গলায একটা গামছা জডিযে কবজোড়ে সে শুধু সেকেন্ড মাস্টাবকে বলল, 'হুজুব এখন যা হুকুম কবেন। আমি তো ডুবলাম।'

পাঁচটাব সমযে আমবা সাজগোজ কবে হোটেল থেকে বেব হলাম। কপিলদেও খেলতে পাবল না। কোবা নাগবা পায়ে হোটেল ঘুবে ঘুবে তাব পাযেব অবস্থা এমনই হযেছে যে শুধু পাযেই এখন ওকে খোঁড়াতে হচ্ছে।

গোলকীপাব হলো হিমাংশু।

আমবা গিয়ে নিজেব নিজেব পজিশানে দাঁড়ালাম।

মিনিট পনেরো-ষোল খেলা হয়েছে কি না হয়েছে, যথারীতি মারামারি আরম্ভ হয়ে গেল। কি করে এবং প্রথম কোন্ পক্ষের দ্বারা আরম্ভ হলো বলা যায় না, তবে একেবারেই পুরো মাত্রায় আরম্ভ হয়ে গেল। প্রথমে ফিল্ডের মধ্যে, তারপর ফিল্ডের বাইরে, গোড়ায় বাইশজনে, তারপর যে কতজন তার হিসেব করা গেল না।

স্টেশনে যখন আমরা একত্রিত হলাম তখন পরস্পরকে চেনা দায়। দংগীর মাথার টিকিই প্রায় লুপ্ত, গোনাগুণতি কয়েকটা চুল রক্তের সঙ্গে লেগে আছে। ওদিকে কপিলদেওর হাতে এক গোছা টিকি, ছোট-বড় বেছে বেছে হিসেব দিল যে ন'টি মস্তক সে নিঃশিখ করে এসেছে। কিন্তু সাধের নাগরা জোড়াটি আর সঙ্গে আনতে পারে নি।

সে যুগে ফুটবল কম্‌পিটিশানের শেষ অঙ্কের অভিনেতা ছিলেন ইন্‌স্‌পেক্টার অফ স্কুল্‌স।

প্রায় মাসখানেক পরে বিনা নোটিশেই একদিন তিনি এসে উপস্থিত হলেন, সঙ্গে ওপক্ষের দুজন শিক্ষক ও কয়েকজন ছাত্র, একজনের চোখের ওপর তখনও পটি বাঁধা।

আমরা সাবধানেই ছিলাম, একদিন না একদিন উনি যে আসবেনই জানা কথা। তাই আমাদের তরফ থেকে বেছে বেছে অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং কোনখানে টাটকা ঘায়ের দাগ আছে এই রকম ছেলেকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। অবশ্য ঐ ধরনের জনকতক প্রকৃত ম্যাচ প্লেয়ারও ছিল।

সেকেন্ড মাস্টার ইন্‌স্‌পেক্টারকে বললেন, 'এই আমাদের প্লেয়ার, স্যার। এখন এই তালপাতার সেপাইরা অতগুলো ছেলেকে তাদের নিজেদের ঘরে গিয়ে ঘায়েল করে এসেছে বলে কি বিশ্বাস করেন?'

ইন্‌স্‌পেক্টার এবার অপরপক্ষের ছেলেদের প্রশ্ন করলেন, 'কি, এরাই সব ছিলো তো?'

একে গণ্ডগোলের সময়ে অত মুখ চিনে রাখা মুস্কিল, তায় ভিন্ জায়গা, তারওপর চোখে ধুলো দেবার জন্য ছিলও জনকতক চেনামুখ ঐ সঙ্গে। ছেলেরা থতমত খেয়ে গেল। একজন তো বলেও ফেলল, 'Yes, sir.'

ইনস্‌পেক্টার তখন তাদের শিক্ষকদের দিকে চেয়ে ঈষৎ হেসে বললেন, 'যা ভোজবাজি দেখিয়েছে বলে এদের যশ দিচ্ছেন, আসলে তা এদের পক্ষে সম্ভব নয়।'

এমন সময় প্রায় আধহাত চওড়া আর পৌনে এক হাত লম্বা একটা কাগজের মোড়ক নিয়ে একটি লোক ঢুকে সেলাম করল। তার দিকে চেয়ে আমাদের সকলেরই মুখ শুকিয়ে গেল। এ সেই শেষের হোটেলওয়ালা।

লোকটা বলল, 'শুধু এরাই লড়েনি হুজুর, আরও একজন ছিলো, সে একাই পঞ্চাশ জনের মোহড়া নিতে পারে। হুজুর যদি হুকুম দেন তবে আমি তাকে চিনিয়ে দিতে পারি, অবশ্য যদি সে ছেলে এসে থাকে।

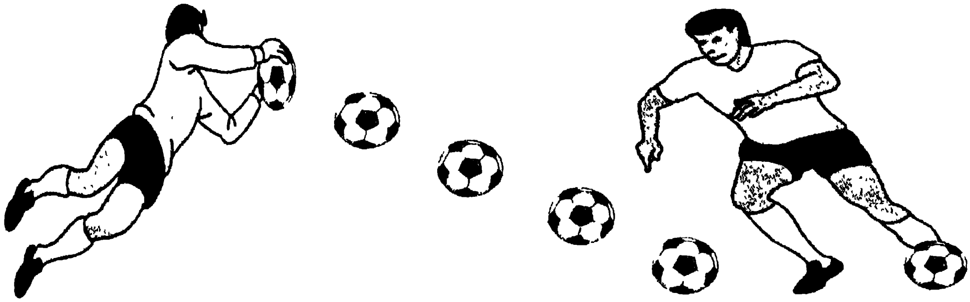
ফিল্ডে নামেনি বলে কপিলের কথা কেউ বড় একটা ভাবে নি। তাই তার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি। এবার আমাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। আবার শুরু হল খোঁজ। এবারে ক্লাসে ক্লাসে। ফার্স্ট ক্লাস দেখে, সেকেণ্ড ক্লাস দেখে, থার্ড ক্লাসের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই আগন্তুকদের মধ্যে একটা গুণগুণ উঠল। তৃতীয় বেঞ্চে কপিলদেও বসেছিল। লোকটা বলল, 'ঐ সে হুজুর।'

ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেব একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে চুরুট টানতে লাগলেন।......

আমরা কপিলদেওকে হারালাম। হুকুম হলো স্কুলের সাধারণ ছেলের সঙ্গে শক্তিগত যার এতটা বৈষম্য, তাকে স্কুল থেকে সরাতে হবে। ক্লাসের রেকর্ড দেখেও যখন বোঝা যায় এ ছেলে পড়বার নয়, অন্য কিছুর জন্যে পোষা।

পরের মাসে খবর পাওয়া গেল ইন্‌স্‌পেক্টারের বিশেষ সুপারিশে কপিলদেও দারোগার পদে নিয়োগ হয়েছে।

[ভাদ্র, ১৩৭১]



# সংখ্যা আবিষ্কার

শশীভূষণ দাশগুপ্ত

সে অনেক দিন আগের কথা। রাজাগণ কেবল রাজ্যস্থাপন করিয়া বসিয়াছেন, ঋষি-মুনিগণ তখনও তপস্যা করিতেন বনে জঙ্গলে।

মানুষ তখনও সংখ্যা গুণিতে জানিত না, প্রয়োজনও ছিল কম।

সেই যুগের মানুষ বংশলোচন বাচস্পতি। অরণ্যেই ছিল তাঁহার বাস; কিন্তু তাই বলিয়া যোগ তপস্যাতেই শুধু যে জীবন কাটাইয়াছেন এমন নয়; বিদ্যার সাধনাই ছিল তাঁহার প্রধান কাজ। সর্বশাস্ত্রে লাভ করিয়াছেন ব্যুৎপত্তি—যাহাকে একেবারে রীতিমত বলে শাস্ত্রে পারঙ্গম।

একাকী বিদ্যাচর্চা করিয়াছেন বংশলোচন, আয়ু এখন হেলিয়াছে পশ্চিমের দিকে। একাকী একদিন বটবৃক্ষতলে বসিয়া ভাবেন তিনি, এত বিদ্যা শিখিলাম তাহা যদি আর কাহাকেও না শিখাইলাম তবে ত সবই বৃথা হইল। লোভ যায় কিছু ছাত্র সংগ্রহ করিয়া চতুষ্পাঠী খুলিতে।

কিন্তু ছাত্র ত না হয় কিছু যোগাড় করা গেল, খরচ বহন করিবে কে? ভাবিয়া কিছু দিশা পান না বংশলোচন।

একদিন ঐরূপ চিন্তান্বিত মনে বসিয়া আছেন বংশলোচন সেই বটবৃক্ষের নীচে। হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, সেই বনপথ দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছেন এক জটাজুটধারী ঋষি। গলায় তাঁহার রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে ভস্ম, হাতে কমণ্ডলু।



দেখিয়া বংশলোচনের মনে হইল সাক্ষাৎ মহেশ্বর।

ঋষিকে দেখিয়া বংশলোচন সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সাষ্টাঙ্গে ধূলায় লুটাইয়া পড়িলেন ঋষির পায়ের কাছে। ঋষি বলেন,— কর কি, ওঠ ওঠ—

কিন্তু পা ছাড়েন না বংশলোচন বাচস্পতি। বলেন,—বাবা, আপনি সাক্ষাৎ শিব।

ঋষি বলেন,—তা শিব হই আর যা হই,—চাই কি তোমার?

বংশলোচন পা দুইটা আরও জড়াইয়া ধরিয়া বলেন,—ছলনা করনা বাবা এই অধমেরে; মনের কথা তোমাদের কিছু অজ্ঞাত থাকে? নিজেই বুঝে নাও সব।

ঋষি দেখিলেন, নাছোড়বান্দা বংশলোচন। বলিলেন, আচ্ছা পা ছাড়, বলছি আমি সব কথা।

আশ্বস্ত হইয়া পা ছাড়েন বংশলোচন। ঋষি সেই ধূলামাটির ভিতরেই খাড়া হইয়া বসিলেন আসনে, ধ্যানে জানিয়া লইলেন বংশলোচনের সব মনের বাঞ্ছা। খানিকক্ষণ পরে চক্ষু মেলিয়া বলিলেন—ছাত্র পড়াবার ব্যবস্থা চাই?

ভক্তিতে কম্পিত হইয়া বংশলোচন বলেন--সাক্ষাৎ মহাদেব তুমি বাবা, ঠিক ধরেছ।

আবার চোখ বুজিয়া ধ্যানস্থ হন ঋষি। বহুক্ষণ পরে চোখ মেলিয়া বলেন—এই বন ধরে অগ্নিকোণে সোজা চলে যাও। চলতে চলতে দেখতে পাবে সাতমুখী একটা নদী। তারই বায়ুকোণে দেখতে পাবে একটা রাজবাড়ি। সে বাড়িতে থাকেন রাজা কর্কট সেন। শরণাপন্ন হও গিয়ে তাঁর, পূর্ণ হবে তোমার মনের অভিলাষ।

তারপরে আবার বনেব ভিতর অদৃশ্য হয়ে যান সেই জটাজুটধারী ঋষি। ঋষি যেখানে পাতিয়াছিলেন তাঁহার আসন, সেখানকার খানিকটা ধূলামাটি তুলিয়া বংশলোচন মাখেন তাঁহার সর্বদেহে। তারপর সোজা রওনা হন অগ্নিকোণ ধরিয়া।

সে কি পথ! কোথাও উপলবন্ধুর, কোথাও গভীর অরণ্য, কোথাও নদীনালা। কিন্তু ফেরেন না বংশলোচন বাচস্পতি।

কতদূর আগাইয়া সত্যই দেখিতে পাইলেন একটা সাতমুখী নদী, সাতদিকে চলিয়াছে জলের সাতটা স্রোত। দেখিয়া তাক্ লাগিয়া যায় বংশলোচনের; ভাবেন মনে মনে, কার্যসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, ঋষি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ মহাদেব।

রাজবাড়ি উপস্থিত হইয়া রাজার দর্শন প্রার্থনা করেন বংশলোচন। রাজা আসিলেন, সঙ্গে আসিলেন মন্ত্রী।

রাজা বলেন,—কি প্রার্থনা ব্রাহ্মণ?

বংশলোচন জানান চতুষ্পাঠীর প্রার্থনা। ছাত্র তিনি নিজেই যোগাড় করিবেন, চাই ধন।

রাজা তাকান মন্ত্রীর মুখে। মন্ত্রী মাথাটাকে ডাইনে হেলান, বামে হেলান, অগ্রে আনেন, পশ্চাতে ফেরান, নিম্নে তাকান, ঊর্ধ্বে তাকান; তারপরে বলিলেন,—মহারাজ ব্রাহ্মণের ধন গোধন; চতুষ্পাঠী করিতে ব্রাহ্মণকে গোধন দান করুন।

রাজা দান করিলেন দুগ্ধবতী অনেক গাভী। অল্প কয়েকজন ছাত্র সংগ্রহ করেন বংশলোচন। জমিয়া গেল বটবৃক্ষের তলেই বংশলোচন বাচস্পতির চতুষ্পাঠী।

এইরূপ চলে কিছুদিন।

রাজা কর্কট সেন আবার একদিন দেখিলেন—রাজ সভার প্রান্তে বসিয়া আছেন বংশলোচন বাচস্পতি। সসম্ভ্রমে ডাকিয়া বলিলেন,—কি ব্রাহ্মণ, আবার কি চাই?

বংশলোচন বলেন,—মহারাজ, গোধন অনেক দিয়াছিলেন, কিন্তু যে কটি ছাত্র, শুধু সেই কটি গোরুই আছে, বাকি গোরুগুলি যে কি হল কিছুই বোঝা গেল না।

মহারাজ বলিলেন,—কেন?

বংশলোচন বলেন,—মহারাজ প্রতিদিন ছাত্রেরা গোরু নিয়ে বেরোয় চরাতে। কটা নিয়ে বেরোয়, কটা নিয়ে ঘরে ফেরে, তা ত ঠিক করে বুঝবার কোন উপায় নেই, শুধু গোরুর রং দেখে ঠিক রাখতে হয়। এত গোরুর কি রং ঠিক রাখা যায় মহারাজ? রোজই তাই কিছু হারিয়ে যায়। হারাতে হারাতে গোহাল যে খালি হয়ে এল,—এতগুলি লোক এখন খাব কি?

বারংবার মাথা চুলকান মহারাজ, ঘন ঘন তাকান মন্ত্রীর প্রতি।—তাইত মন্ত্রী এখন কি করা যায়?

মন্ত্রী ভাবিতে সময় লইলেন অনেকদিন, অনেক রাত্রি। শেষটায় আসিয়া বলিলেন, মহারাজ গাভী পিছু একটা করিয়া লোক দিন এই ব্রাহ্মণের সঙ্গে, গোরু হারাইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

সেই ব্যবস্থাই হইল। লোকে ভরিয়া গেল বংশলোচনের চতুষ্পাঠী। গোরু এখন হারায় না বটে; কিন্তু এত লোককে এই আশ্রমে পুষিয়া রাখে কে?

ভাবনা চিন্তা আর কিছুতেই ছাড়েনা বংশলোচনকে। কিন্তু এইভাবেই দিন চলে, চতুষ্পাঠী ভরা কেবল গোরু আর প্রতিটি গোরুর পিছনে একটি করে রক্ষক।

সেদিন বিকেল বেলা, নদীর তীরে বসিয়া মহাভারত পড়াইতেছিলেন বংশলোচন তাঁহার ছাত্রগণকে। তালপাতায় লেখা মহাভারত।—তখন ত সংখ্যা ছিল না, তাই বলিতে হয়, মহাভারতের সেই তালপাতার পুথিতে পাতা ছিল অসংখ্য;—মাটি হইতে পুথিখানি ছিল দেড় হাত উঁচু।

তন্ময় হইয়া পড়াইতেছেন গুরু—তন্ময় হইয়া শুনিতেছে শিষ্যগণ। বনপত্র মর্মরের ভিতর দিয়া ছুটিয়া আসিল একটা ঘূর্ণি হাওয়া, মুহূর্তে উড়াইয়া লইয়া গেল মহাভারতের পাতাগুলি; খেয়াল বসে সেগুলি ছড়াইয়া দিল এখানে সেখানে—কোথায়--কতদূরে।

কপালে—আঘাত করিয়া হায় হায় করিয়া উঠিলেন বংশলোচন। ছোটো—সকলে ছোটো—সংগ্রহ কর সবগুলি পাতা—একটাও যেন না হারায়।

সংগৃহীত হইল অনেক পাতা; কিন্তু তাহাই সব কিনা কি করিয়া বোঝা যায়? তা ছাড়া কোন্ পাতার পর কোন্ পাতাটা বসিবে তাহাই বা স্থির করিবার উপায় কি?

বিষণ্ণ মনে বসিয়া বসিয়া অনেক ভাবেন বংশলোচন,—এখন উপায় কি?

উপায় আর কিছুই আসেনা মাথায়। তখন অনন্যোপায় হইয়া তিনিও আসনে বসিলেন, ধ্যানে স্মরণ করিতে



লাগিলেন সেই জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর।

সর্বজ্ঞ এই জটাজুটধাবী সন্ন্যাসী—আবার আসিয়া দেখা দিলেন বংশোলোচনের সম্মুখে,—কি হে, কি চাই?

চোখের জলে সন্ন্যাসীব পা ভিজাইয়া বংশলোচন বলেন,—কি হবে প্রভু আমার মহাভারতের?

প্রভু বলিলেন,—এক কাজ কর, একখানি একখানি করিয়া পাতা পড়ে যাও,—যে পাতাখানি যে পাতার সঙ্গে মেলে, তাকে সেইভাবে মিলিয়ে নাও, তবেই দেখবে আবার গোটা মহাভারত পেয়ে যাবে।

অগত্যা সেই চেষ্টাই করেন বংশলোচন। কিন্তু কাটিয়া যায় অনেক বৎসর। কয়েকটি মাত্র ছাত্র লইয়া এতবড় বই তিনি কিছুতেই মিলাইয়া উঠিতে পারেন না।

হতাশায় ভাঙিয়া পড়ে তাঁহার মন। একদিন বিমর্ষমুখে আবার গিয়া উপস্থিত হন রাজবাড়ি।

ব্রাহ্মণের সব কথা শোনেন রাজা। তাইত, কি বিপদ। কি হইবে উপায়। পরামর্শের জন্য ঘন ঘন মন্ত্রীর দিকে তাকান রাজা।

মুখ গম্ভীর করিয়া ভুরু কুঁচকাইয়া অনেকক্ষণ ভাবেন মন্ত্রী, তারপরে বলেন রাজাকে,—মহারাজ এক কাজ করতে হবে। ব্রাহ্মণের মহাভারতে যতগুলি পাতা আছে, রাজদুর্গ হইতে ততগুলো সৈন্য পাঠান। তারা প্রত্যেকে একটা করে পাতা ধরে থাকবে। ব্রাহ্মণ তখন যে-পাতার পরে যে পাতা, তা পড়ে লোকগুলোকে আগে সাজিয়ে নেবে, তারপরে তাদের হাত থেকে সব পাতাগুলি জড় করে নিলেই আবার গোটা বই পাওয়া যাবে।

মহারাজ গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—তা বটে, কিন্তু বড় ব্যয়-বাহুল্য।

—কিন্তু মহারাজ উপায় কি?

—তাইত।

অতএব সেই ব্যবস্থাই হইল। দুর্গ হইতে কুচ্‌কাওয়াজ করিয়া সারি সারি সৈন্য চলিল ব্রাহ্মণের চতুষ্পাঠীতে। বন-বাদাড় সব তছ্‌নছ্‌ হইয়া গেল, এখানে সেখানে পড়িতে লাগিল সৈন্যদের তাঁবু, রাজ্যের মানুষ ত তাজ্জব বনিয়া গেল। মহাভারতের পাতা গুছাইতে দুর্গের সৈন্য সবই চলিযা গেল বংশলোচনের চতুষ্পাঠীতে।

খবরটা কেমন করিয়া পৌঁছিল প্রতিবেশী রাজা মর্কট সেনের কানে। তিনি দেখিলেন, এই ত সুবর্ণ সুযোগ। বহুবার পরাজিত এবং অপমানিত হইয়াছেন তিনি কর্কট সেনের কাছে; কিন্তু এখন ত রাজধানীতে সৈন্য নাই মোটেই, সুতরাং এখনই কর্কট সেনের রাজধানী আক্রমণ করিয়া সকল পরাজয় এবং অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাক্‌।

একদিন সকাল বেলা কর্কট সেন বসিয়া আছেন রাজসভায়। সহসা হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল দূত। বলিল, মহারাজ সর্বনাশ। রাজধানী আক্রমণ করেছে মর্কট সেন।

রাজা বলেন,—কেন, আমার সৈন্য-সামন্ত?

দূত বলে,—তারা সবই চলে গেছে মহাভারতেব পুথি ঠিক করিতে ব্রাহ্মণের চতুষ্পাঠীতে।

—তবে উপায়?

মন্ত্রী বলেন, মহারাজ, শীঘ্র লোক পাঠান চতুষ্পাঠীতে, ফিরে আসুক সব সৈন্য, কাজ নেই এখন মহাভারতে।

রাজার আদেশে ছুটিয়া আসিল সব সৈন্য। ভয়ে আবার পলাইয়া যায় মর্কট সেন।

কিছুদিন যায়। ব্রাহ্মণ আবার বসিযা থাকে রাজসভায় বিষণ্নমুখে,—মহারাজ, শাস্ত্রপাঠ বন্ধ, এখন উপায়?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মন্ত্রী এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। বলিলেন,—মহাভারতের পাতাগুলি পরস্পর সাজাইয়া প্রত্যেক পাতার কোনায় একটা পারম্পর্যের চিহ্ন দিয়া রাখা হউক, তবে আর কোন গোলমাল হইবার সম্ভাবনা নাই।

চতুষ্পাঠীতে ফিরিয়া আসিয়া আবার তাহাই করিতে থাকেন বংশলোচন।

কিন্তু পাতার যে আর শেষ নাই, কত চিহ্ন দিবেন বংশলোচন। নূতন চিহ্ন ত আর মাথায় জোগায় না।

ফিরিয়া আসেন বংশলোচন রাজসভায়, বলেন,—মহারাজ, নতুন চিহ্ন ত আর জোগায় না মাথায়!

শুনিযা মহারাজ বলেন,—তাইত!

মন্ত্রীও বলেন,—তাইত!

আবার ভাবিতে বসেন মন্ত্রী, উর্বর মস্তিষ্ক তাঁহার। হুঁ, এইবারে ঠিক হইয়াছে। মন্ত্রী বলিলেন,—ব্রাহ্মণ, এক কাজ করুন। প্রথম গোটা কয়েক চিহ্ন ঠিক করে নিন, তার পরে সেই গুলোকেই একটার সঙ্গে আর একটু জুড়ে নোতুন নোতুন চিহ্ন তৈরী করে ফেলুন।

বংশলোচন চতুষ্পাঠীতে ফিরিয়া এইবারে দেখিলেন, কাজটা ত অতিশয় সোজা।

তিনি প্রথম যে চিহ্ন কয়েকটা আবিষ্কার করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাই—এক হইতে নয় এবং শূন্য। এই করিয়াই সংখ্যা গণনার আবিষ্কার হইয়া গেল।

বংশলোচন বাচস্পতির চতুষ্পাঠী দিন দিন সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিতে লাগিল, মহারাজ কর্কট সেনও সুখে সোয়াস্তিতে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

# হবির রাজা ডাকটিকিট

শান্তিভূষণ রায়




জয়ন্তকে নিয়ে আর পারা যায় না। ছোট কাকু অফিস থেকে ফেরামাত্রই হাজির। উদ্দেশ্য আব কিছু নয়, যদি নতুন কোন ডাকটিকিট পাওয়া যায়। তা প্রায়ই যে না পায় তা নয়। ছোটকাকারও একদিন ডাকটিকিট সংগ্রহের হবি ছিলো, আজ আর নেই। পুরানো এ্যালবাম কয়টা আজ জয়ন্তেব দখলে।

ওর দেখাদেখি আমিও চুপি চুপি ক্যাটালগ, চিমটে, এ্যালবাম, ষ্ট্যাম্প হিঞ্জেস, পারফোরেশান গেজ, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, আরো টুকিটাকি জিনিস কিনে এনেছিলাম, তবু আমার টিকেট যেন জমতেই চায়না। মাঝে মাঝে ডাকটিকিটের দোকান থেকে পাঁচমেশালি টিকিটের প্যাকেটও কিনতাম। তবে, একটা একটা করে টিকিট জোগাড় করতে না পারলে যেন ভালো লাগে না, বিদেশী বন্ধু নেই যে বিনিময় করে নতুন টিকেট জোটাবো, তাই, জয়ন্তেব দেখাদেখি ছোটকাব কাছে মাঝে মাঝে হানা দিতাম।

পৃথিবীতে যে কতো ছাঁদের, কতো রঙের লোক আছে আর তাদের খেয়ালও নানান রকমের। কেউ ছোট বড় বেয়াড়া নুড়ি জোগাড় করেন, কেউবা নানা প্রজাপতি, কেউ ঝিনুক সংগ্রহ করেন। আবার কেউবা ফুলেব বাগান কিংবা কাঠের কাজের উৎসাহী। কারো সঙ্গে কাবো যেন মিল নেই। মেজ মামাতো পুবানো বই এনে বাড়ি বোঝাই করে ফেলেছে। আবাব মাসতুত বোন রত্না দেশবিদেশের পুতুল এনে আলমারী বোঝাই করেছে। কার যে কি ভালো লাগে কে জানে। আমিইবা পিছিয়ে থাকি কেন? লেগে গেলাম।

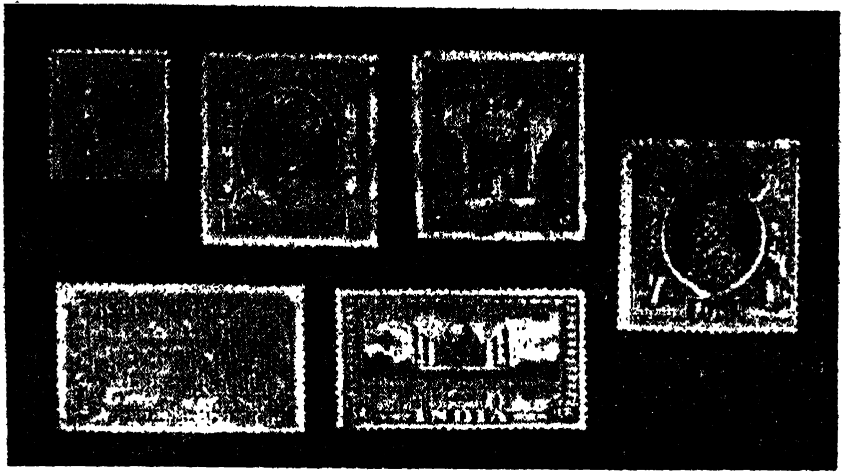
তবে এটা ঠিক যে, এখনও যত রকমের 'হবি' আমরা দেখি তার মধ্যে ডাকটিকিট সংগ্রহ হলো অন্যতম 'হবি'। এই জন্যই একে বলা হয়, 'দি কিং অব দি হবিজ'।

ছোট কাকা সেদিন একখানা সপ্তম এডোয়ার্ডের সময়ের ডাকটিকিট এনেছেন। আমরা তাই নিয়ে বসেছি। আমিই আনাড়ীর মতো প্রশ্ন করেছিলাম, এই বুঝি 'ভারতবর্ষের' প্রথম টিকিট। ছোটকাকা হযতো হেসেছিলেন, বললেন; নাবে, তারো আগে অনেক টিকিট বেরিয়েছিলো। ছোটকাকা ভারতের টিকিটের এ্যালবামটা টেনে নিয়ে বসলেন। বললেন; ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ ডাকটিকিট সংগ্রহ করেছেন প্রচুব। তাঁর পরবর্তী ষষ্ঠ জর্জ ও দ্বিতীয় এলিজাবেথরও ডাকটিকিটে সমান আগ্রহের কথা আমাদের জানা। বর্তমানে ডাকটিকিট সংগ্রহে প্রধান তিন জনের নাম আমরা পেয়েছি। এর দুজন হলেন ফ্রান্সের আর তৃতীয় ব্যক্তি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। হাঙ্গেরির ফিলিপ আর. বি, ফেরারীকে আমরা একজন প্রধান সংগ্রহকারী বলে ধরতে পারি। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ তুলনাহীন। মিশরের রাজা ফারুকেব সংগ্রহও কম ছিলোনা।

পৃথিবীর প্রথম ডাকটিকিট সংগ্রহকারী হলেন একজন ইংরেজ মহিলা। তাঁর একটা খেয়ালখুশির জন্যেই প্রথম তিনি ডাকটিকিট সংগ্রহ করেন। শুধু তাই নয় ইংলণ্ডেই প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছে ৬ই মে, ৮৪০ খ্রীঃ এবং তার পরিকল্পনা করেন স্যার রোল্যাণ্ড হিল। এঁরই অনুরাগী স্যার বার্টল ফ্লর ১৮৭২ খ্রীঃ ১লা জুলাই 'সিন্ধ ডিষ্ট্রিক ডাক' ছাপ দিয়ে সিন্ধু প্রদেশে এশিয়ায় প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশ করেন। তার আগে আমরা জানি, জুরিখে ও জেনেভাতে ডাক-টিকিট প্রকাশিত হয়েছিল।

ভারতে প্রথম যে সব ডাকটিকিট ছাপা হয়েছিল তাব কিন্তু কাজে লাগেনি। ১৮৫০ খ্রীঃ কলকাতার টাঁকশালে

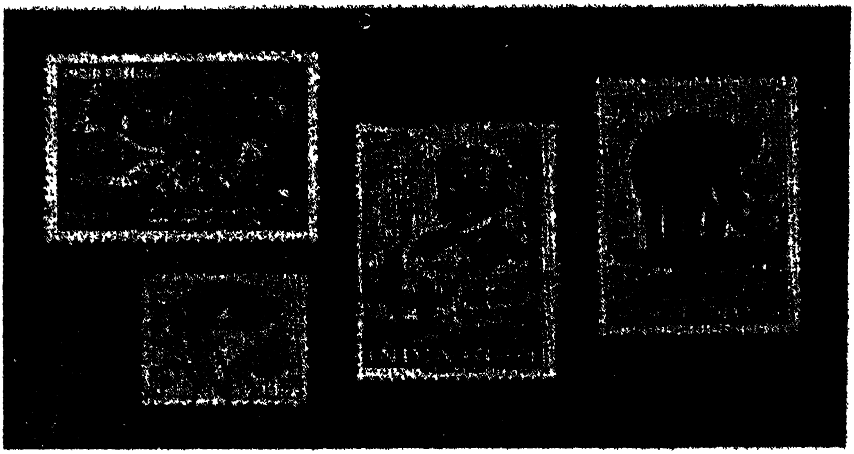
কর্ণেল ফর্বেসের নক্সা অনুসারে ছাপানো 'তালগাছ আর সিংহ' ছাপ মারা টিকিট কাজে লাগেনি। তারপর ভারতীয় সার্ভে অফিসের ২ পয়সা দামের লাল রঙে লিথোতে খিলানের নক্সাসহ ছাপা টিকিটও কোন কাজে লাগে নি। আবার ১৮৫৭ খ্রীঃ আট খিলানের নক্সাসহ নীল রঙে ছাপা ২ পয়সার টিকিট প্রকাশিত হয়। এরপরে আরো কতোবার রঙ আর নক্সা পরিবর্তন হয়েছে। লণ্ডনে ডি. লা. রু এ্যণ্ড কোং ১৮৫৫ খ্রীঃ নভেম্বরে ভারতের জন্য ডাকটিকিট ছেপে পাঠায়। ১৮৬৬ খ্রীঃ হাতীর মাথায় জলছাপসহ কয়েকটি টিকিট প্রকাশ করা হয়। "ইষ্ট ইন্ডিয়া পোষ্টেজ" ছাপসহ ১৮৮২ খ্রীঃ অবধি ডাকটিকিট ভারতে চলছিলো। ১৮৮৭ খ্রীঃ চম্বা, ফরিদাকোট, গোয়ালিয়র, ঝিন্দ, পাতিয়ালা ও আরও কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে "ইন্ডিয়া পোষ্টেজ" ছাপসহ



সর্বভারতীয় টিকিট প্রচলন হয়। কবদ রাজ্যসমূহ, আলোযাব, বুন্দি—এদেব সঙ্গেও একই চুক্তি অনুষ্ঠিত হয়।

১৮৯১ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী মহারাণী ভিক্টোরিয়াব ছবিসহ দু'রঙা টিকিটগুলোব দাম যথাক্রমে দুই টাকা, তিন টাকা ও পাঁচ টাকা। ১৯০২-৩ খ্রীঃ সপ্তম এডোয়ার্ডের ডাকটিকিট এবং ১৯১১ খ্রীঃ পঞ্চম জর্জের ডাকটিকিট ছাপা হয়েছিলো। টেলিগ্রামের জন্য ১৮৬০ খ্রীঃ ইলেকট্রিক টেলিগ্রাম টিকিট ৪ আনা, ১ টাকা আর ৪ টাকা মূল্যের প্রকাশিত হয়, টিকিটের মধ্যে মহারানী ভিক্টোরিযার ছাপ ছিলো তাহলে দেখছি, ১৮৫৫ খ্রীঃ ও ১৮৬৬ খ্রীঃতে ২ পয়সা, ১ আনা, ২ আনা, ৪ আনা, আর ৮ আনার ডাকটিকিট ইংলণ্ড থেকে ছেপে ভারতে এসেছে। ১৮৬৬-৮০ খ্রীঃতে 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া পোষ্টেজ' টিকিট ৫ রকমের ছাপা হয়েছিলো। ১৮৫৪ খ্রীঃ ৩ রা নভেম্বর মাদ্রাজে ও ২৩শে নভেম্বর বোম্বাইতে ভারত তথা এশিয়ার প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছিলো।

আমাদের সামনেকার টেবিলে কয়েকটা এ্যালবাম ছড়িয়ে আছে। ছোটকাকু অতি সন্তর্পণে এ্যালবামের পাতা আমাদেব সামনে তুলে ধরেছেন। এ তাঁর ব্যক্তিগত সখের জিনিস। আজ না হয় জয়ন্ত পরম যত্নে সেগুলি নিজের করে নিয়েছে। তবু; হারিয়ে যাওয়া অনেক ডাকটিকিটই 'ভারতের ডাকটিকিট' চিহ্নিত এ্যালবামে নেই। কিন্তু; এ্যালবাম সম্পূর্ণ করার কোন ত্রুটি তিনি করেন নি। কোথাও ফাঁকা জায়গায় হাতে ডাকটিকিটের ইতিহাসটাই লিখে রেখেছেন, কোথাওবা বিভিন্ন কাগজে ছাপানো ফটোতে তোলা টিকিটের অংশ জুড়ে রেখেছেন। আর যে সব টিকিট তিনি সংগ্রহ করতে পেরেছেন তাদের সম্পূর্ণ পরিচয় সযত্নে লিখে রেখেছেন। দেখেই বোঝা যায়. তিনি একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। সাধাবণত আমরা তিন ধরনের ডাকটিকিট সংগ্রহকারী দেখতে পাই। একদল আছে যাঁরা পৃথিবীর সব দেশের ডাকটিকিট সংগ্রহ করেন, আরেকদল আছেন যাঁরা শুধু বিশেষ কোন দেশের টিকিট সংগ্রহ করেন আর তৃতীয় দলের লোক কোন বিশেষ ধরেনের টিকিট সংগ্রহ করেন; এঁদের বলা হয় থিমেটিক কালেক্টর। আমাদেব বাবুয়া এই তৃতীয় দলের, তাঁর শখ শুধুমাত্র স্মরণীয় ব্যক্তিদের স্মরণে যে সব ডাকটিকিট বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত হয় সেগুলি সংগ্রহ। ছোট কাকা ছিলেন দ্বিতীয় ধরনের তিনি শুধু ভারতীয় ডাকটিকিটই সংগ্রহ করেছিলেন। আর আমিতো আনাড়ী; যে কোন ডাকটিকিট পেলেই রেখে দি। ডাকটিকিটগুলো রাখার এবং সংগ্রহে যে একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে তাই জানতাম না। ছোটকাকাই বলেছিলেন; বুঝলে জয়ন্ত; ডাকটিকিট হাতে এলেই কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখবে। যেমন, কবে ডাকটিকিটটি প্রকাশিত হয়েছে;



কি ভাবে ও কেন প্রকাশিত হয়েছে; জলছাপ আছে কি না আর ছাপাইবা কেমন; ছাপাতে কোন ভুল আছে কিনা। পারফোরেশান ভেঙ্গে গেছে কিনা, টিকিট 'মিন্ট' না 'ক্যান্সেলড'। অনেকে 'মিন্ট' বা অব্যবহারিত, যথাযথ পারফোরেশান আর পেছনের আঠা লাগান টিকিট সংগ্রহ করতে ভালবাসেন, অপর দল আবার ব্যবহার (ক্যান্সেলড্) করা হয়েছে এমন সব টিকিট সংগ্রহ করেন। ইণ্ডো-আমেরিকান সোসাইটির ডাকটিকিট প্রদর্শনীতে গেলে অনেক নতুন টিকিট দেখতে পাবে। তাছাড়া ক্যালকাটা ফিলাটেলিক সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান ফিলাটেলিক সোসাইটি (কলকাতা) কিংবা; বোম্বের ইণ্ডিয়ান ফিলাটেলিক সোসাইটিকে ডাকটিকিট সংগ্রহকারীদের স্বর্গ বলতে পার।

বাবুয়া আর থাকতে পারলো না। বললে আগে ডাকটিকিটের কথা শেষ করোতো; আগের টিকিটতো তোমার নেই এখন আর পাবোও না।

বাবুয়ার উৎসাহ বাড়বে নাই বা কেন, ছোটকাকু প্রত্যেকটি ডাকটিকিটের তলায় টিকিটের যাবতীয় খবর লিখে রাখতেন, কবে প্রকাশিত হয়েছিলো, কোন দেশের, যদি কোন স্মরণীয় ব্যক্তির ছাপসহ ছাপা হয়, তাঁর জীবনী ও বাণী; কতো কি।

ছোট কাকা বললেন; মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময়ে ডাকটিকিটের উপরে 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া পোষ্টেজ'' ছাপ উঠে গিয়ে 'ইণ্ডিয়া পোষ্টেজ' ছাপানো শুরু হলো। ১৯৫১ খ্রীঃ তোমরা ভারতীয় টেলিগ্রাফের শতবার্ষিকীতে ২ আনা আর ১২আনার ডাকটিকিট দেখেছ। ১৯৩১ খ্রীঃ টেলিগ্রামের জন্য স্বতন্ত্র ছাপা ডাকটিকিট বন্ধ হয়ে যায়, ১৮৫৭ খ্রীঃ, ১৮৬০ খ্রীঃ আর ১৮৬৭ খ্রীঃ টেলিগ্রাফের টিকিট প্রকাশিত হয়েছিলো। ১৯২৬ খ্রীঃ অবধি ইংলণ্ডের ডি. লা. রু কোম্পানি ভারতের ডাকটিকিট ছাপছিলো। তারপর থেকে নাসিকের সিকিউরিটি প্রেসেই আমাদের ডাকটিকিট ছাপা হচ্ছে।১৯৪৮ খ্রীঃ ১৫ই আগষ্ট ৩টি বিভিন্ন নক্সার ডাকটিকিট মহাত্মা গান্ধীর স্মরণে প্রকাশিত হয়। এই টিকিটগুলো ছাপা হয় সুইজারল্যাণ্ডে। ১৯২৯ খ্রীঃ ১লা নভেম্বর থেকে ভারতের ডাকটিকিটের নব অধ্যায় শুরু হলো । এই দিনেই প্রথম ভারতীয় বিমান ডাকটিকিট ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৩৮ খ্রীঃ আবার 'রেভিনিউ' টিকিট ছাপা হয়। ১৯৩৫ খ্রীঃ পঞ্চম জর্জের ২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে টিকিট ছাপা হয়েছে। ১৯৮২ খ্রীঃ নেতাজী ভিয়েনা থেকে ২ লাখ 'আজাদ হিন্দের' ডাকটিকিট ছাপেন, কিন্তু টিকিটগুলো কোন কাজে আসেনি। ১৯৫৩ খ্রীঃ 'ভারতীয় সংরক্ষক কটক, কোরিয়া'' এবং ১৯৫৩ খ্রীঃ ইণ্ডো চায়না আন্তরাষ্ট্রীয় আয়োগের টিকিট ছাপা হয়েছিলো। ১৯৩৭ খ্রীঃ আমরা ২৫টাকা দামের ষষ্ঠ জর্জের টিকিট পেয়েছি। ১৯৮৬ খ্রীঃ 'ভিক্টরী সেট' টিকিট প্রকাশিত হয়েছিলো।

এরপর ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ খ্রীঃ ভারত স্বাধীন হলো। ঐ দিনেই বের হয় স্বাধীন ভারতের প্রথম ডাকটিকিট ৬পয়সা ১৪ পয়সা আর ১২ আনা দামে। ৬ পয়সার টিকিটে ছিলো অশোক স্তম্ভের ছবি, ১৪ পয়সার টিকিটে ভারতের জাতীয় পাতাকা আর ১২ আনার টিকিটে এ্যারোপ্লেনের ছাপ। সবকটি টিকিটের উপর লেখা ছিলো 'জয় হিন্দ'। এর পরে ১২ আনার একটি ডাকটিকিট ''এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল—ফার্ষ্ট ফ্লাইট এইটথ জুন

১৯৪৮" ছাপসহ ছাপা হয়। ১৯৪৮ খ্রীঃ ১৫ আগষ্ট ৪টি বিভিন্ন নক্সার টিকিটে সুইজারল্যাণ্ড থেকে ছাপা হয়েছিলো মহাত্মা গান্ধীর স্মরণে।

ডাকটিকিটের মাধ্যমে কোন দেশ তার শিল্প, সাহিত্য সভ্যতা, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, ইতিহাস, অনেক কিছু প্রকাশ করতে পারে, জগতের সামনে তুলে ধরতে পারে। এবং সেইজন্য ডাকটিকিটের নক্সা, চিত্র রঙ, ছাপার গুরুত্ব কম নয়। সুখের কথা, ভারতীয় ডাকটিকিট তার সম্মানের শীর্ষে আরোহণ করতে চলেছে। ১৯৪৯ খ্রীঃ ১৫ই আগষ্ট দেবদেবীর মূর্তির ছবিসহ কিছু ডাকটিকিট ছাপা হয়েছে। ১ পয়সার টিকিট—অজন্তা চিত্র, ২ পয়সার টিকিটে—কোনারকের বিখ্যাত ঘোড়া, ৩ পয়সার টিকিটে—ত্রিমূর্তি, ১ আনার টিকিটে—বোধিসত্ত্ব, (বুদ্ধদেবের হাত উল্টো ছাপা হয়েছিলো), ২ আনার টিকিটে— নটরাজের বিশ্বখ্যাত ছবি, ১২ পয়সার টিকিটে সাঁচিস্তূপ, ১৪ পয়সার টিকিটে—বুদ্ধগয়ার মন্দির, ৪ আনার টিকিটে—ভুবনেশ্বর মন্দির, ৬ আনার টিকিটে—বিজাপুরের গোল গোম্বুজ, ৮ আনার টিকিটে—মহাদেবের মন্দির, ১২ আনার টিকিটে—অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দির, ১ টাকার টিকিটে —চিতোরগড়ের বিজয়স্তম্ভ, ২ টাকার টিকিটে —লালকেল্লা, ৫ টাকার টিকিটে—তাজমহল, ১০ টাকার টিকিটে—কুতুবমিনার আর ১৫ টাকার টিকিটে— শত্রুজয় মন্দিরের ছবিসহ প্রকাশিত হয়েছিলো।

তাছাড়া, ইউনিভার্সাল পোষ্টাল ইউনিয়নের ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৪৯ খ্রীঃ ৪ রকমের ডাকটিকিট ছাপা হয়। জিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষেও ১৯৫১ খ্রীঃ ১৩ই জানুয়ারী ২ আনার ডাকটিকিট গণেশ মূর্তির ছবিসহ ছাপা হয়েছিলো।

১৯৫১ খ্রীঃ ৪ঠা মার্চ—১১ই মার্চ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসের স্মরণে ২ আনা আর ১২ আনার দুটি টিকিট এশিয়ান গেমসের টর্চের ছাপসহ ছাপা হয়েছিলো। ভারতের শিল্প সাহিত্য ধর্ম সঙ্গীত জগতের উজ্জ্বল স্মরণীয়দের ছবিসহ কিছু ডাকটিকিট ১৯৫২ খ্রীঃ ১লা অক্টোবর ছাপা হয়। যেমন, তিন পয়সার টিকিটে — কবির, ১ আনার টিকিটে—তুলসীদাস, ২ আনার টিকিটে মীরাবাঈ, ৪ আনার টিকিটে—সুরদাস, সাড়ে চার আনার টিকিটে— গালিব আর ১২ আনার টিকিটে —রবীন্দ্রনাথের ছবি ছাপা হয়েছিলো।




রেলওয়ের শতবার্ষিকী স্মরণে ১৯৫৩ খ্রীঃ ১৬ই এপ্রিল ২ আনার ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৮৫৩ খ্রীঃ রেল ইঞ্জিন ও ১৯৫৩ সনের রেল ইঞ্জিনের ছবি ছিলো। তেনজিং এর কথাতো আমরা জানি। ২৯শে মে ১৯৫৩ খ্রীঃ মাউণ্ট এভারেষ্ট বিজয়ের সফলতা স্মরণ করে ২ আনার ও ১৪ আনার মাউণ্ট এভারেষ্টের ছবিসহ ছাপা হয়েছিলো। পরের পাতায় এরপর ১লা নভেম্বর ১৯৫৩ খ্রীঃ টেলিগ্রাফ শত বার্ষিকীতেও ২ আনা আর ১২ আনার দুটি টিকিট ছাপা হয়েছিলো। এতে ১৮৫১ খ্রীঃ এর টেলিগ্রাফ পোষ্ট আর ১৯৫১ খ্রীঃ-এর টেলিগ্রাফ পোষ্টের ছবি ছিলো। ডাক বিভাগের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ১লা অক্টোবর ১৯৫৪ খ্রীঃ ৪ রকমের ডাকটিকিট ছাপা হয়েছে। ১ আনার টিকিটে— ডাকহরকার,

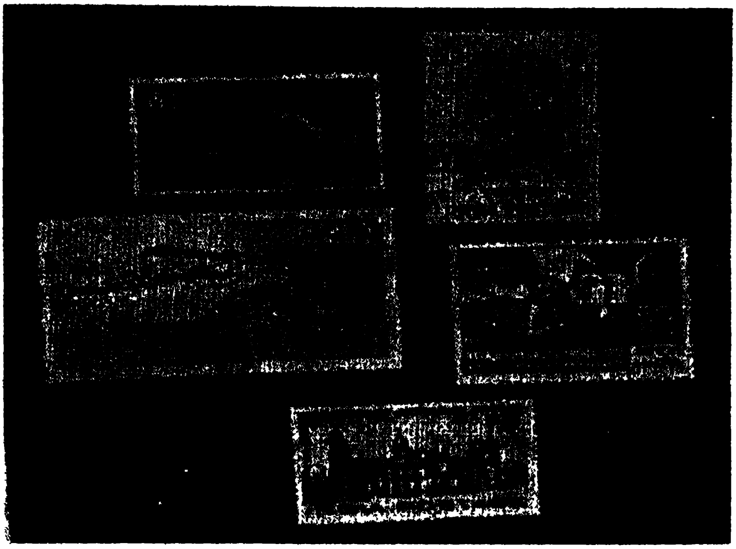
উটের ডাক আর গরুর গাড়ীর ডাক, ২ আনার টিকিটে পায়রার ঠোঁটে চিঠি এবং ১৪ আনার টিকিটে এ্যারোপ্লেনে ডাকবহনের ছবি ছাপা হয়েছিলো। ৪ আনার টিকিটে—সাইকেলসহ ডাকপিয়ন, জাহাজ, রেল আর প্লেনের ছবি ছাপা হয়েছিলো।

প্রথম যখন ভারতে সর্বভারতীয় ডাকটিকিট বেরুলো টিকিট 'ক্যান্সেলড্' ছাপ এমনভাবে মারা হতো যাতে টিকিট দুবার ব্যবহার করা না যায়। ১৮৫৪ খ্রীঃ ভারতবর্ষে ৪টি ডাকবিভাগ ছিলো। যারা এই সব পুরানো 'ক্যান্সেলড্' টিকিট সংগ্রহ করেছেন তাদের সংগ্রহ একদিক থেকে মূল্যবান। গোলাকৃতি কিংবা চতুর্ভুজ আকারের ছাপ মারা হতো আর তাদের কালিও ছিলো নানান রকমের, যেমন, লাল, নীল, সবুজ কিংবা বেগুনি। যে ছাপ দেওয়া হতো তাতে সার্কেল বা বিভাগের প্রথম অক্ষর ও ডাকঘরের নম্বর দেওয়া থাকতো। যেমন; বাংলা ডাকবিভাগের প্রথম অক্ষর 'বি' এই অক্ষরটি এই ডাকবিভাগের অধীনস্থ সব ডাকঘরের ছাপে থাকতো আর তার সংগে ডাকঘরের সংখ্যা, যেমন, কলিকাতা 'বি' ১, কিংবা, রেঙ্গুন 'বি' ১৫৬ অথবা ঢাকা 'বি' ৬২। এই সময়কার এইসব 'ক্যান্সেলড্' টিকিট সত্যিই সংগ্রহ করবার মত।

ছোটকাকা একটু থামলেন। বললেন; ভারতীয় ডাকটিকিটের একশত বছরের এই হলো সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। জানি তোমরা আরো অনেক ইতিহাস, অনেক খবর সংগ্রহ করবে একদিন, আজকের ডাকটিকিটের সঙ্গে তাদের তুলনা করবে। তবু আমরা ভারতীয় ডাকটিকিটের যে পরিচয় পাই তাতে বিশ্বের ডাকটিকিটের রাজ্যে তার নিজ নিজ বৈচিত্র্যে, বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। ভারতীয় ডাকটিকিট ভারতীয় সংস্কৃতি, স্থাপত্য, সভ্যতা, শিল্পের ঐতিহ্যকে তুলে ধরবে বিশ্বের সামনে। শতবর্ষের পরে আজো নতুন নতুন ডাকটিকিট ভারতে ছাপা হচ্ছে। বিস্তৃত পরিচয় আজ আর দেবার অবকাশ নেই, তবু আরো সংক্ষিপ্তভাবে বলা যেতেপারে।

শুধু ভারতের স্মরণীয় ঘটনা বা ঐতিহ্যকে নিয়েই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন স্মরণীয় ঘটনার ছবিও ভারতীয় ডাকটিকিটে লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ইউ, এন, ও-র পরিচয় জ্ঞাপক চিহ্ন এবং পদ্মফুলের ছবিসহ ২ আনার ডাকটিকিট ২৪শে অক্টোবর, ১৯৫৪ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। ১৯৫৪ খ্রীঃ ১১ই ডিসেম্বর দেরাদুনে অনুষ্ঠিত ওয়ার্লড্ ফরেস্ট কংগ্রেসের অধিবেশনকে স্মরণ করে ২ আনার একটি ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছিলো। ১৯তম ইন্টারন্যাশনাল রেডক্রস সম্মেলনের স্মরণে ১৫ নয়া পয়সার একটি ১৯৫৭ খ্রীঃ ২৮শে অক্টোবর ছাপা হয়েছে। এটিই প্রথম দু'রঙের ফটো গ্রেভিতে ছাপা ভারতীয় ডাকটিকিট।

১৯৫৫ খ্রীঃ ২৬শে জানুয়ারী ১৬ টি বিভিন্ন ধরনের ডাকটিকিটের মাধ্যমে ভারতের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন তুলে ধরা হয়েছিলা। ২ আনা ও ১৪ আনা দামের টিকিট ছাপা হয়েছিলো ১৯৫৬ খ্রীঃ ২৪শে মে তারিখে বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষে। ১৯৫৬ খ্রী ২৩শে জুলাই তিলকের স্মরণে ২ আনা দামের ডাকটিকিট ছাপা হয়েছিলো। ১লা এপ্রিল ১৯৫৭ সনে ভারতের মানচিত্রসহ কয়েকটি ডাকটিকিট ছাপা হয়েছে। এই ধরনের ডাকটিকিট এখনও প্রচুর ছাপা হচ্ছে। সিপাহী বিদ্রোহের স্মরণে ১৯৫৭ খ্রীঃ ১৫ই আগষ্ট ১৫ নয়া পয়সা আর ৯০ নয়া পয়সার ডাকটিকিট ছাপা হয়েছে। তাছাড়া, ১৫ নয়া পয়সার টিকিটে —ঝাঁসির রাণী লক্ষীবাঈ ও ৯০ নয়া পয়সার একটি চমৎকার টিকিট ১৯৫৭ খ্রীঃ ১লা এপ্রিল ছাপা হয়েছে। চাচা নেহেরু আজ আর আমাদের মাঝে নেই। তাঁর স্মরণে একটি ডাকটিকিট ১৯৬৪ খ্রীঃ ১০ই জুন ছাপা হয়েছে। শ্রী নেহেরুর ৬৮তম জন্মদিবসে বালদিন উপলক্ষে ১৯৫৭ খ্রীঃ ১৪ই নভেম্বর কয়েকটি টিকিট ছাপা হয়েছিলো। যেমন, ৮ নয়া পয়সার টিকিটে—একটি ছেলে কলা খাচ্ছে, ১৫ নয়া পয়সার টিকিটে—একটি মেয়ে শ্লেটে লিখছে, ৯০ নয়া পয়সার টিকিটে—বিষ্ণুপুরের পোড়া মাটির ঘোড়া। ভারতের তিনটি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকীতে ১০ নয়া পয়সার তিন ধরনের টিকে ছাপা হয়েছে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৭ খ্রীঃ। ১৫ নয়া পয়সার একটি টিকিটে টাটার কারখানা ও জামসেদজি টাটার ছবিসহ একটি ডাকটিকিট টাটা কোম্পানির ৫০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে১৯৫৮খ্রীঃ মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের পশুদের ছবিসহও কিছু ডাকটিকিট ছাপা হয়েছিলো। ১৯৫৮ খ্রীঃ ১ লা এপ্রিল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের ২৫ বৎসর পূর্তিতে ১৫ ও ৯০ পয়সার টিকিট ছাপা হয়েছে। ১৮ই এপ্রিল ১৫৫৯ খ্রীঃ ডঃ কার্ভের ছবিসহ ১৫ নয়া পয়সার একটি ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। ২৩শে জানুয়ারী ১৯৬৪ সনে নেতাজির স্মরণেও দুটি ডাকটিকিট ছাপা হয়েছে। ২৯শে জুন, ১৯৬৪ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম শতবার্ষিকীতেও ছবিসহ একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়েছে। ১৯৫১-৫২ খ্রীঃ বিবিন্ন সওদাগরি অফিসে ফ্রাঙ্কিং মেশিন ব্যবহার চালু করায় ডাকটিকিটের ব্যবহার বড় বড় সওদাগরি অফিসগুলিতে কমে আসছে।



ছোটকাকা বললেন; ডাকটিকিট সংগ্রহের হবিকে সত্যিই 'দি কিং অব দি হবিজ' বলা চলে। ডাকটিকিট সংগ্রহের কতো বিচিত্র গল্প আমরা শুনি। রাজা ফারুকেব ব্যক্তিগত সংগ্রহ ১ লাখ পাউণ্ডে বিক্রি হয়েছিলো। পৃথিবীর অন্যতম সংগ্রাহক মিঃ ফেরারীর সংগ্রহের মূল্য আর্থিক ও বৈচিত্র্যের দিকে তুলনাহীন। ডাকটিকিটের অন্যতম প্রধান একক সংগ্রহকারী ফেরারী তাঁর বাবার কাছেই প্রথম টিকিট সংগ্রহের উৎসাহ পেয়েছিলেন। ফেরারীর বাবাকে দেশ-বিদেশে ঘুরতে হতো অনবরত। বাড়ী ফেরার সময় নিয়ে আসতেন ছেলের জন্যে নানান রঙের ডাকটিকিট। আর তাই পরম উৎসাহে জমিয়ে রাখতেন ফেরারী।

ইংলণ্ডের সেই বিশ্বের প্রথম ডাকটিকিট সংগ্রাহককে জাল টিকিটের কারবারী বলে সন্দেহ করে কতো নাজেহাল করা হয়েছিলো। কি হয়েছিলো জান? তখন সবেমাত্র ১ পেনি দামের ডাকটিকিট বেরিয়েছে ইংলণ্ডে। এক ভদ্রমহিলার সখ হলো তিনি ডাকটিকিট দিয়ে ঘরের দেওয়াল সব মুড়ে দেবেন। তখনকার দিনে ইংলণ্ডে ভালো দামি কাগজ দিয়ে ঘরদোর মুড়ে দেবার রেওয়াজ ছিলো। ভদ্রমহিলা তো নতুন শখে মেতে উঠলেন; জোগাড় করতে শুরু করলেন প্রচুব ডাকটিকিট। তাঁর হাতে প্রচুর টিকিট জমেওছিলো। একদিন হলো কি, একগাদা ডাকটিকিটের বাণ্ডিলের পার্শেল হঠাৎ কোন কাবণে ভেঙে যায়। ডাকঘরেব লোকজনতো অবাক, এতো টিকিট এলো কি করে? কেনইবা একজন অমন গাদা গাদা টিকিট নিচ্ছেন। খোঁজ খবর শুরু হয়ে গেলো। ওঁরা ভাবলেন, নিশ্চয়ই এগুলো সব জাল টিকিট। ডাকবিভাগের সন্দেহ অনুসন্ধানের জ্বালায় ভদ্রমহিলাতো কেঁদে বাঁচেন।

আরেকবার বিলেতে কি হয়েছিলো শুনবে? নতুন একটা ডাকটিকিট বেরিয়েছে। দেখতে দেখতে সব ফুরিয়ে গেল। তখন লণ্ডনে ছাপা টিকিট বিভিন্ন ডাকঘরে পৌছাতে অনেক সময় লাগতো। টিকিট ফুরিয়ে গেলো কিন্তু লোকজন ছাড়বে কেন। লণ্ডন থেকে টিকিট এসে পৌছাতেও কম করে ৪/৫ মাস কেটে যাবে, কর্তারা তখন ওখানকার ছাপাখানাকে বললেন টিকিট ছাপতে। আগের টিকিটের নক্সা অনুযায়ী একটা নক্সা তৈরী তো হলো কোনরকমে কিন্তু টিকিটের মাঝখানের জাহাজের ছবি আর তৈরী করা গেলনা, শেষটায় জাহাজ কোম্পানির বিজ্ঞাপনের একটা ছবিসহ টিকিট ছেপে দেওয়া হলো আর তাই বিক্রী হয়ে গেলো হু হু করে। আমাদের দেশেই দেখ না বুদ্ধজয়ন্তীতে ছাপা টিকিট হাত উল্টো ছাপা হয়ে বেরুলো। ডাকটিকিটের আরো কতো মজার ঘটনা যে আছে। তাই মানুষের এতো বিচিত্র খেয়ালের মাঝে ডাকটিকিট সংগ্রহের 'হবি' আজো অনেককে নতুনভাবে আকর্ষণ করে।

# আদিপর্ব

জয়ন্ত চৌধুরী



ভারতবিখ্যাত প্রাইভেট্ ডিটেক্‌টিভ মনীশ গুপ্তর নাম আজ কে না জানে? স্বয়ং পুলিস কমিশনার সাহেব কোন জটিল কেসের কূল কিনারা করতে না পারলে মনীশ গুপ্তকে ডাকেন পরামর্শের জন্যে।

কিন্তু এই বিখ্যাত লোকটির সাফল্যের আদিপর্ব অর্থাৎ একেবারে গোড়াকার ইতিহাসের সঙ্গে বোধহয় অনেকেই পরিচিত নয়। সেই গোড়াকার কথাই আজ বলব।

সে আজ কুড়ি বছরেরও আগেকার কথা। ইডেন্ গার্ডেনের ব্যান্ড স্ট্যান্ডের কাছে একটা বেঞ্চে বসে একটি আধাবয়সী ভদ্রলোক অন্যমনস্কভাবে সিগারেট টানছিলেন, এমন সময় একটি কুড়ি-একুশ বছরের ছেলে তাঁর পাশে এসে বসল। শ্যামবর্ণ, চোখদুটো বেশ বড় বড় এবং জ্বলজ্বলে, লম্বাটে গড়ন। পরনে আধময়লা খাটো ধুতি এবং সস্তাদরের খেলো একটা টুইল সার্ট্।

ছেলেটি কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎ একসময় বলে উঠল, "একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি স্যার?"

ভদ্রলোক বলে উঠলেন—"আমাকে বলছো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—আপনাকেই বলছি। বলছিলুম আপনার সন্ধানে কোন চাকরি-বাকরি খালি আছে? ভদ্দরলোকের ছেলে, বেকার বসে আছি; দয়া করে একটু যদি সুলুক্-সন্ধান বলে দেন।"

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে কি ভাবলেন, তারপর হঠাৎ একসময় বলে উঠলেন—"তুমি কি কাজ করতে চাও?"

"আজ্ঞে, যে কাজ দেবেন।"

একটু হেসে ভদ্রলোক বললেন—"হাইকোর্টের জজিয়তি যদি দিই,—পাববে?"

ছেলেটি একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে উত্তর দিলে—"হাইকোর্টের জজিয়তি কববার মত বিদ্যেবুদ্ধি যদি থাকতো, তাহলে আপনার কাছে বোধ হয় আসতুম না স্যার।"

ভদ্রলোক ছেলেটির দিকে একবার আড়-চোখে চেয়ে নিয়ে চাপা গলায় বললেন—"হুঁ!"—তারপর পূর্বের মতই সিগারেট টেনে যেতে লাগলেন।

এইভাবে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ একসময় ভদ্রলোক বলে উঠলেন—"দূরে ঐ ঝোপটার কাছে একটি লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছ? আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে? ও লোকটি সম্বন্ধে তোমার মনে কি ধারণা হয়?"

ছেলেটি বলে উঠল—"তা কেমন করে বলব স্যার? তবে যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে একটা কথা বলতে পারি।"

"বেশ বল।"

"যে কোন কারণেই হোক, আপনি ও-লোকটাকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন।"

"কিসে বুঝলে?"

"এটা বোঝা আর শক্ত কি স্যার? আপনি লোকটার দিকে একবার চাইলেনও না, অথচ লোকটা যে ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তার গায়ে যে আদ্দির পাঞ্জাবি রয়েছে, সেটা লক্ষ্য করেছেন। এরথেকে একথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, আপনি ওকে অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছেন, অথচ লোকটি যাতে সে কথা জানতে না পারে, তার জন্যও চেষ্টার কসুর নেই। এথেকে এটা আবিষ্কার করা আদৌ শক্ত নয় যে, আপনি লোকটাকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন। কেমন, ঠিক কিনা বলুন স্যার?"

ভদ্রলোক আবার চুপ করে গেলেন এবং পূর্বের মতই অন্যমনস্কভাবে সিগারেট টানতে লাগলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটাবার পর ভদ্রলোক হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে ছেলেটির হাতে দিয়ে বললেন—"তুমি কাল সকাল নটার সময় আমার সঙ্গে দেখা করবে। কার্ডে ঠিকানা রইলো।"

কথাটা শেষ করেই ভদ্রলোক হাইকোর্টের দিকে হন্ হন্ করে পা চালিয়ে দিলেন। ছেলেটি কার্ডটা হাতে নিলে বটে, কিন্তু দৃষ্টি তার সেই ঝোপটার দিকে। সে যা ভেবেছিল, ঠিক তাই। দেখলে, আদ্দির পাঞ্জাবি পরা ঝোপের ধারের সেই লোকটিও হাইকোর্টের দিকে চলতে শুরু করেছে।

ছেলেটি আপন মনেই বললে—"ব্যাপারটা কিছুই বুঝলাম না।" তারপর হঠাৎ একসময় বলে উঠলো—"চুলোয় যাক্, ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই।"

কথাটা শেষ করেই সে কার্ডখানার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। পরক্ষণেই বড় বড় চোখ দুটো তার আরও বড় হয়ে উঠলো। কার্ডের ওপর লেখা ছিল—"প্রভাত গাঙ্গুলি, প্রাইভেট্ ডিটেক্‌টিভ্।—নং ক্রিক্ রো।"

কার্ডখানা পকেটে ফেলে সে আপন মনে বিড় বিড় করে বলে যেতে লাগলো—"কি আশ্চর্য! বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ্ প্রভাত গাঙ্গুলির সঙ্গে এতক্ষণ আলাপ করছিলুম?—অতবড় একটা লোকের সঙ্গে কথা কইছি তা যদি ঘুণাক্ষরেও জানতুম, তাহলে কি অমন করে যা-তা আবল-তাবল বকতুম? ছিঃ ছিঃ ভদ্রলোক কি মনে করলেন?"

কিন্তু পরক্ষণেই একটা অভূতপূর্ব আনন্দে তার বুকটা ভরে উঠলো। এই অদ্ভুতকর্মা লোকটির সম্বন্ধে সম্ভব-অসম্ভব কত কথাই না সে এতদিন শুনে এসেছে। আজ সেই লোকটি শুধু তার সঙ্গে আলাপ করেনি, তাকে বাড়িতে গিয়ে দেখা করবার জন্যে কার্ড দিয়ে গেছে। এর চেয়ে সৌভাগ্য তার পক্ষে আর কি হতে পারে?

পরদিন বেলা ঠিক নটার সময় ছেলেটি প্রভাত গাঙ্গুলর ক্রিক্ রোর বাসায় গিয়ে হাজির। প্রভাতবাবু তাকে সুমুখের একটা চেয়ারে বসতে বললেন। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে ইজিচেয়ারটার ওপর হেলান দিয়ে বেশ আরাম করে বসে বললেন—"তোমার নামটি ত এখনো পর্যন্ত শুনলুম না।"

"আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীমনীশচন্দ্র গুপ্ত।"

"বেশ!—দেশ কোথায়?"

"আজ্ঞে, বারাসতের কাছে।"

"হুঁ!—কলকাতায় চাকরির সন্ধানে এসেছ বুঝি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কতদূর পর্যন্ত পড়েছ?"

"আজ্ঞে, ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত। ফি জোগাড় করতে পারিনি বলে পরীক্ষা দেওয়া হয় নি।"

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর টেবিলের ওপর থেকে একটা লেটারপ্যাড্ তুলে নিয়ে কি লিখতে বসলেন।

লেখা শেষ হলে কাগজটা ভাঁজ করে একটা খামে পুরে মনীশের হাতে দিয়ে বললেন—"খামের ওপর যে ঠিকানা দিলুম, সেই ঠিকানায় গিয়ে নবগোপালবাবুর সঙ্গে দেখা করবে। তিনি তোমাকে কাজ দেবেন।"

খামটা হাতে নিয়ে মনীশ জিজ্ঞেস করলে—"আজ্ঞে, তাঁর ওখানে কি কাজ করতে হবে?"

"সেটা তিনিই তোমাকে বাতলে দেবেন। আমি কেবল গোটাকতক কথা তোমাকে বলতে চাই মন দিয়ে শুনে যাও। প্রথম কথা হচ্ছে এই যে যাঁর কাছে তোমাকে পাঠাচ্ছি, তিনি হচ্ছেন একজন ভারতবিখ্যাত লোক। লোকটি যেমন ধনী তেমনি পণ্ডিত। ভদ্রলোক বিবাহ করেন নি। যে বাড়িতে তোমাকে পাঠাচ্ছি সে বাড়িতে তিনি একাই

থাকেন, আর থাকে চাকর-বাকর এবং কয়েকজন কর্মচারী। বাড়িটাকে তিনি পুরোদস্তুর একটি মিউজিয়াম করে তুলেছেন। দোতলার একটা ঘরে তিনি নিজে থাকেন। পাশের ঘরে থাকে মিউজিয়ামের কয়েকজন কর্মচারী এবং তারও ওপাশের ঘরে থাকে চাকর-বাকরেরা। একতলাটা খালিই পড়ে থাকে। তেতলার ঘরগুলোতে থাকে তাঁর মহামূল্য দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহগুলো। কত রকমের অদ্ভুত অদ্ভুত সংগ্রহ যে তাঁর আছে, তা বলে শেষ করা যায় না। তাঁর কোন কোন সংগ্রহ খৃষ্টপূর্ব ছয় হাজার বছরেরও আগেকার। এই সব সংগ্রহের পিছনে ভদ্রলোক লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। সে যাক্, এখন কাজের কথা বলি। আজ কয়েকদিন হোলো ভদ্রলোকের সংগ্রহাগার থেকে একটি অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস চুরি গেছে। জিনিসটা হচ্ছে অশোকের সময়কার একটি অটুট বুদ্ধ মূর্তি। মূর্তিটা একটি আস্ত নীলা থেকে কুঁদে বার করা।

এই চুরির কিনারা করার জন্যে ভদ্রলোক সম্প্রতি আমার শরণাপন্ন হয়েছেন। তোমাকে ওখানে পাঠাচ্ছি চাকরি করার জন্যে বটে, কিন্তু সেইটেই তোমার আসল কাজ নয়। ওখানে তুমি যে কাজই করনা কেন, জানবে—সেটা আসলে হচ্ছে লোক দেখান ব্যাপার। তোমার আসল কাজ হচ্ছে ও বাড়ির চাকর-বাকর এবং কর্মচারীদের ওপর নজর রাখা। কেমন করে নজর রাখবে বা বিশেষ করে কার কার ওপর নজর রাখবে সেটা এখান থেকে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়; ওখানে থাকতে থাকতে তুমি নিজেই সেটা বুঝতে পারবে। প্রতিদিন রাত নটার পর আমার সঙ্গে দেখা করে ওখানকার খবরাখবর দেবে। আমার চিঠি নিয়ে আজই বিকেলের দিকে নবগোপালবাবুর সঙ্গে দেখা করবে। বেশ করে চারিদিকে নজর রাখবে। কাউকে বিশ্বাস করবে না, তা সে যেই হোক্ না কেন।"

বেলা পাঁচটা আন্দাজ মনীশ গিয়ে হাজির হলো নবগোপালবাবুর বাড়িতে। পেল্লায় তেতলা বাড়ি; বড় বড় জানালা-দরজা, লম্বা লম্বা হল। ইয়া উঁচু উঁচু তলা। বসত-বাড়ি না বলে তাকে আফিস্-বাড়ি বল্লেই বোধ হয় ঠিক হয়।

একটা প্রকাণ্ড টেবিলের সামনে গদিমোড়া একটা দামী চেয়ারে বসেছিলেন নবগোপালবাবু। রোগা জরাজীর্ণ চেহারা, বার্ধক্যের সমস্ত লক্ষণই চেহারায় পরিস্ফুট। গায়ে একটা গলাবন্ধ লংক্লথের কোট। পায়ে একটা সাধারণ কট্‌কি চটি।

প্রভাত গাঙ্গুলির চিঠিটা পড়া শেষ করে চশমার পুরু কাঁচদুটোর ভিতর দিয়ে মনীশের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন—"ঐ চেয়ারটাতে বস। তোমার নামই মনীশ গুপ্ত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বেশ, তোমাকে আমি আজ থেকেই কাজে লাগিয়ে দিতে চাই। কি কাজ তোমাকে দিই বলত? বুঝতেই ত' পারছ মিউজিয়ামের কাজটা হচ্ছে একটা অছিলা মাত্র। আসলে তোমাকে করতে হবে গোয়েন্দাগিরি। এখন আসল কথা হচ্ছে, তোমাকে কি কাজ দেওয়া যায়।" তারপর কিছুক্ষণ কি ভেবে বললেন—"আচ্ছা হয়েছে; তুমি আজ থেকে হলে আমার পার্সনাল অ্যাসিস্টেন্ট। আজ থেকেই তা হলে কাজে লেগে যাও—কেমন? এখানকার অদ্ভুত চুরির সম্বন্ধে প্রভাতবাবুর কাছ থেকে সবই শুনেছ নিশ্চয়; সুতরাং সে সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলবার দরকার হবে না বোধ হয়?"

মনীশ বললে—"আজ্ঞে হ্যাঁ, সবই শুনেছি। কেবল একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই।"

"বল কি জানতে চাও?"

"বলছিলুম, আপনি কি আপনার কর্মচারীদের কাউকে সন্দেহ করেন?"

"না না আদৌ নয়, আদৌ নয়। আমার বিশ্বাস কোন দর্শকই এই কাজ করেছে। প্রতিদিন বহু লোকই ত মিউজিয়াম দেখতে আসে। তাদেরই কেউ সম্ভবত মূর্তিটা সরিয়েছে। ছোট্ট একরত্তি জিনিস বৈ ত নয়।"

"আচ্ছা, আপনারা কখন টের পান যে মূর্তিটা চুরি গেছে?"

"চুরির বোধ হয় এক মিনিট পরেই।"

"তখুনি দর্শকদের সব আটক করে তাদের জামা-কাপড় সার্চ্ করলেই ত পারতেন।"

"তাও করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি।"

"আপনার কর্মচারীদের জামা-কাপড় সার্চ্ করেছিলেন?"

"না, তা করা হয় নি। তার কারণ যে তিনজন কর্মচারী তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই

অত্যন্ত বিশ্বাসী এবং বহুকালের লোক। তাঁদের সন্দেহ করতে গেলে নিজেকেও সন্দেহ করতে হয়। প্রভাতবাবু অবশ্য এজন্যে আমাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করেছেন। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এখানে আমি আদৌ ভুল করিনি।"

মনীশ বললে—"আপনি এঁদের যত পারেন বিশ্বাস করুন, আপত্তি নেই, কিন্তু আমার আসল পরিচয়টা দয়া করে এঁদের দেবেন না।"

"আরে না না, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।"

"আর একটা কথা জিজ্ঞেস করবো।—এঁরা কি রাত্রে এখানেই থাকেন?"

"হ্যাঁ!—ওঁদের শোবার ঘর তেতলায়। খাওয়া-দাওয়াও ওঁদের এইখানেই হয়। তোমার সম্বন্ধে অবশ্য কোন রকম বাঁধাবাঁধি নিয়ম রাখতে চাই না। তুমি ইচ্ছে করলে এখানেও থাকতে পার; আবার না ইচ্ছে করলে অন্য রকম ব্যবস্থাও করতে পার। বিকালে চা-খাওয়াটা আমরা এক সঙ্গেই করে থাকি ঠিক ছ-টায় সময় আমরা চায়ের টেবিলে বসি। ঐ সময় চা খেতে খেতে আমাদের কাজের কথা হয়। তুমি ইচ্ছে করলে ঐ সময় আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পার।"

একটু ভেবে মনীশ বললে—"বিকেলে আপনাদের চায়ের টেবিলে যোগ দেওয়া আমার পক্ষে দরকার হবে বলে মনে করি। কেন না ঐ সময় ওঁদের তিনজনকেই একসঙ্গে পাবো এবং সে সুযোগে ওঁদের সঙ্গে পরিচয়টাও হয়ে যাবে।"

আজ তিন দিন হলো মনীশ নবগোপালবাবুর অ্যাসিসটেন্টের পদে বহাল হয়েছে। প্রতিদিন বিকেলে ছ-টার সময় নবগোপালবাবুর চায়ের টেবিলে হাজরে দিতে সে ভোলে না। এর ফলে মিউজিয়ামের কর্মচারী তিনটির সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে। তিনজনেরই বয়স ষাটের ওপর। বহুকাল থেকে এই কাজে এঁরা লেগে রয়েছেন। মিউজিয়ামটি এঁদের প্রাণের চেয়ে প্রিয়। এর উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধির জন্যে এঁরা চিরটাকাল প্রাণপণে খেটে এসেছেন এবং এখনও খাটছেন। সত্যিই এঁদের সন্দেহ করতে মন কিছুতেই চায় না।

নবগোপালবাবুর ওখানেই মনীশ তার শোবার ব্যবস্থা করেছিল। খাওয়া-দাওয়া সেরে শয্যায় শুয়ে সে ভাবতে লাগলো—কি করা যায় এখন? একটা কোন সূত্র ধরে তাকে এগুতে হবে তো; কিন্তু কোন সূত্রই তার হাতের কাছে নেই। বিছানায় শুয়ে সে ভাবতে লাগলো—কি ভাবে কাজ শুরু করা যায়?

ভাবতে ভাবতে রাত একটা বাজলো, দুটো বাজলো, তিনটে বাজলো, তবু কোন সূত্রই সে খুঁজে পেল না। এমনি করে আরও একটা ঘণ্টা কেটে গেল। দূরে একটা গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে চারটে বেজে গেল। হঠাৎ মনীশ লাফিয়ে উঠলো—হয়েছে, হয়েছে, একটা উপায় মাথায় এসেছে। হ্যাঁ, হবার হলে ঐতেই কাজ হবে নিশ্চয়ই। উৎসাহে এবং আনন্দে তার মনটা ভিতরে ভিতরে নেচে উঠতে লাগলো।

পরের দিন বিকাল ছ-টার সময় নবগোপালবাবু চায়েব টেবিলে বসেছেন। তাঁর সামনাসামনি তিনটে চেয়ার দখল করে বসেছেন হরিহর চাটুয্যে, মন্মথ দত্ত আর প্রবোধ মিত্তির; অর্থাৎ মিউজিয়ামের তিনজন প্রধান কর্মচারী। একটা চেয়ার খালি পড়ে রয়েছে মনীশের জন্যে।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে হরিহরবাবু বললেন,—"মনীশবাবুকে দেখছি না কেন?"

নবগোপালবাবু বললেন—"তাকে পাঠিয়েছি একটা কাজে; বোধ হয় আটকে পড়েছে কোথাও।"

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হন্তদন্ত ভাবে মনীশ ঘরে ঢুকলো এবং নিজের চেয়ারটা দখল করে বসেই বলে উঠলো—"আজ একটা ভারি ইন্টারেস্টিং খবর আছে স্যার!"

একটা সন্দেশ মুখে পুরতে পুরতে নবগোপালবাবু বললেন—"তাই নাকি! কি খবর শুনি?"

মনীশ শুরু করলে—"আজ্ঞে ঘুরতে ঘুরতে বেলা তিনটা নাগাদ ভারি ক্ষিদে আর তেষ্টা পেয়ে গেল। আমি তখন ধর্মতলার মোড়ে। সমুখেই বেশ বড় গোছের একটা রেস্তোরাঁ দেখে ঢুকে পড়লুম। সবকটা টেবিলই ভর্তি, কেবল ঘরের কোণে একটা টেবিল খালি ছিল, অগত্যা সেইটেই দখল করে বসলুম।

আপন মনে চা খাচ্ছি, এমন সময় একটি লোক তাঁর নিজের সিট্ ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে এসে আমার পাশের চেয়ারটাতে বসলেন। আধাবয়সী ভদ্রলোক, গায়ে মট্কার দামী পাঞ্জাবি, হাতে সোনার ওয়াচ; ভদ্রলোক নিজেই যেচে আলাপ শুরু করলেন "আপনার নামটি শুনতে পাই কি?"

বললুম—"আমার নাম মনীশ গুপ্ত। কেন বলুন ত?"

ভদ্রলোক একটা চাপাহাসি ঠোঁটের ডগায় এনে খুব মোলায়েম সুরে বললেন—"তাহলে আমি বোধহয় নবগোপালবাবু নবনিযুক্ত অ্যাসিস্টেন্টের সঙ্গে কথা বলছি?"

বললুম—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

ভদ্রলোক একটা মোটা সিগারেট ধরিয়ে কয়েকটা টান দিয়ে গলাটাকে অত্যন্ত খাটো করে বললে—"আমার ঠিকানা এবং ফোন নম্বরটা দয়া করে টুকে রাখবেন কি?"

বললুম—"কেন বলুন ত?"

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে ভদ্রলোক বললেন—"দরকার হোতে পারে ত।"

বললুম—"আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভদ্রলোক আগের মতই খাটো এবং মিহি কণ্ঠে বললেন—"নবগোপালবাবুর মিউজিয়ামের মহামূল্য জিনিসগুলোর প্রতি যথেষ্ট লোভ আছে, এরকম লোক কলকাতা শহরে দু-চারজন থাকাটা আপনি কি অসম্ভব মনে করেন? অবশ্য তার জন্যে উপযুক্ত খরচ করতেও তারা পিছপা নন দু-দশ হাজার টাকা তাঁদের কাছে কিছুই নয়, অথচ আপনাদের মত ছাপোষা লোকের কাছে সেটা হয়ত অনেক কিছু, কেমন, নয় কি? যাই হোক্, যদি কখন দরকার বোঝেন, তাহলে...."

কথাটা শেষ করেই ভদ্রলোক পকেট থেকে ফাউন্টেনপেন বের করে একটা কাগজে নাম ঠিকানা ফোন-নম্বর টুকে আমার হাতে দিলেন। তার পরেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"আমি পরশু বম্বে রওনা হচ্ছি। যদি কোন কথা থাকে তাহলে কাল রাত ঠিক ন-টার সময় আমাকে ফোন করবেন। আচ্ছা নমস্কার!"

কথাটা শেষ করেই ভদ্রলোক রেস্তোরাঁ ছেড়ে চলে গেলেন। আমি কেমন যেন হতভম্বের মত বসে রইলুম।

নবগোপালবাবু বললেন—"কই দেখি দেখি সেই কাগজটা।" তারপর কাগজটা চোখের সুমুখে মেলে ধরে পড়তে লাগলেন—"নির্মলচন্দ্র লাহিড়ি,—নং ফণি মিত্রের লেন, কলিকাতা। ফোন্ নং ৩৫.... ... .।"

কাগজটা টেবিলের ওপর রেখে নবগোপালবাবু কি বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিয়ে হরিহরবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন—"কিছু মনে করবেন না স্যার, আমাকে একটু উঠতে হলো। মাথাটা হঠাৎ কেমন যেন.. বোধ হয় ব্লাড্ প্রেসারটা....আপনারা বসুন, আমি একটু...।"

নবগোপালবাবু ব্যস্ত সমস্তভাবে বলে উঠলেন—"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! কাউকে ডাকবো না কি?— সঙ্গে যাবে?"

"না, না, দরকার হবে না, আমি নিজেই ঠিক যেতে পারবো।"—বলেই ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সেই দিনই রাত্রে মনীশ গিয়ে দেখা করলে প্রভাতবাবুর সঙ্গে। তাকে দেখেই প্রভাত গাঙ্গুলি বলে উঠলেন—"আজ নিশ্চয়ই কোন সুখবর আছে?"

"কি করে জানলেন স্যার?"

"তোমার মুখের চেহারা সে কথা আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে। কোন সূত্রটুত্র পেলে নাকি হে? দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ঐ চেয়ারটাতে ভাল করে বস।"

চেয়ারে বসে মনীশ বললে—"আজ্ঞে সূত্রটুত্র কিছুই পাইনি, তবে সূত্র একটা নিজেই বানিয়ে নেবো ঠিক করেছি। আপনাকে কিন্তু সে সম্বন্ধে এখন কিছুই বলব না স্যার।"

"কিছুই বলবে না?"

"আজ্ঞে না। আমাকে দয়া করে নিজের মত কাজ করতে দিন স্যার। কিছু মনে করবেন না ত? তাহলে অবশ্য..."

বাধা দিয়ে প্রভাত গাঙ্গুলি বললেন—"আরে না, না, কিছুই মনে করব না। তুমি অত কিন্তু হচ্ছ কেন? নিজের ওপর বিশ্বাস থাকাই তো দরকার।"

উৎসাহ পেয়ে মনীশ বলে উঠলো—"আপনাকে কিন্তু একটি কাজ করতে হবে স্যার।"

"কি কাজ বল।"

"কাল রাত ঠিক নটার সময় এক জায়গায় আপনাকে উপস্থিত থাকতে হবে। সেটা হচ্ছে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি। আমি ঠিক সময়ে এসে আপনাকে নিয়ে যাবো।"

"বেশ, ভাল কথা। আর কিছু করতে হবে আমাকে? হুকুম কর।"

মাথা চুলকোতে চুলকোতে মনীশ বললে—"কি যে বলেন স্যার, তার ঠিক নেই. আপনি আমাকে ঠাট্টা করছেন।"

একটু হেসে প্রভাত গাঙ্গুলি বললেন—"আরে না না, ঠাট্টা করতে যাবো কেন? চিয়ার আপ্ ইয়ং সোলজার। এই তো চাই। নিজের বুদ্ধির ওপর আস্থা না থাকলে কেউ কখন বড় হতে পারে? এখন তোমার বক্তব্য বলে যাও দেখি।"

"আজ্ঞে রাত ঠিক ন-টার সময় আমার সেই আত্মীয়ের বাড়িতে একজন ফোন্ করবে আপনাকে নয়, অন্য একজন লোকের নামে।"

"বেশ, তার পর?"

"যে নামেই ফোন্ করুক, আপনি জানাবেন আপনিই সেই লোক এবং সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করবেন—"আপনার নাম কি মনীশ গুপ্ত?" উত্তর আসবে—না, আমার নাম মনীশ গুপ্ত নয়, আমার নাম অমুক। তারপর লোকটি আপনাকে জানাবে যে সে আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে চায়। আপনি খুব আগ্রহ দেখিয়ে বলবেন,—বেশ, আপনার জিনিস নিয়ে এখুনি চলে আসুন, আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করে রইলুম। আপনি হাসছেন স্যার?"

"না, না হাসতে যাবো কেন। আমি তোমার হাতমুখ নাড়ার সুন্দর ভঙ্গিটি উপভোগ করছিলুম।"

"আপনি তাহলে আমার কথা মন দিয়ে শোনেন নি?"

প্রভাত গাঙ্গুলি মুখে বললেন বটে যে মনীশের কথা তিনি খুব মনোযোগ সহকারে শুনেছেন, আসলে কিন্তু তিনি এই ছেলেটির ছেলেমানুষি এবং তার চেয়ে তার সরল আত্মবিশ্বাসটুকু বেশি করে উপভোগ করছিলেন।

পর দিন রাত ন-টার কিছু আগে প্রভাতবাবুকে মনীশ তার আত্মীয়ের বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। ঠিক ন-টার সময় ঝন ঝন্ করে টেলিফোন-যন্ত্রটা বেজে উঠলো। রিসিভারটা তুলে নিয়ে প্রভাত গাঙ্গুলি হাঁকলেন—"হ্যাল্লো—কে আপনি?—হ্যাঁ, হ্যাঁ বলুন কি বলবার আছে। কি বললেন?—একটা জিনিস আমাকে দেখাতে চান,—আজই, এখুনি?—বেশ ত।—আপনার নাম—মনীশ গুপ্ত?—কি বললেন?—আপনি মনীশ গুপ্ত নন?—বেশ, বেশ।—নামেতে কি আসে যায়।—তাহলে আপনি আপনার জিনিস নিয়ে এখুনি চলে আসুন,—হ্যাঁ এখুনি—আচ্ছা নমস্কার।"



আধঘণ্টাও বোধ হয় কাটেনি, হঠাৎ একটা ট্যাক্সি এসে দরজার সমুখে দাঁড়ালো। মনীশ বললে—"আমি পাশের ঘরে রইলুম স্যার। ঠিক সময় বুঝে এসে হাজির হবো।"

পরক্ষণেই উড়ে বেহারার পেছনে পেছনে একটি বৃদ্ধ লোক ঘরে ঢুকলেন, হাতে তাঁর একটা টিনের কৌটো। প্রভাতবাবু তাঁকে খাতির করে বসালেন। ভদ্রলোক ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন—"জিনিসটা নির্ভয়ে দেখাতে পারি বোধ হয়?"

"সম্পূর্ণ নির্ভয়ে, এখানে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। শুধু আপনার জন্যই নয়, আমার নিজের জন্যেও যথেষ্ট সাবধান হবার দরকার আছে, সে কথাটা ভুলে যাচ্ছেন কেন?"

অতঃপর টিনের কৌটোটার ভিতর থেকে যে জিনিসটি বেরুলো, তার দিকে চেয়ে প্রভাতবাবু অবাক হয়ে গেলেন। কি আশ্চর্য! এযে নবগোপালবাবুর সেই নীলার বুদ্ধমূর্তি!

এই সময় সহসা পাশের ঘরের পর্দাটা হঠাৎ সরে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকলো মনীশ।

সেইদিক পানে একবার মাত্র চেয়েই বৃদ্ধলোকটি বিদ্যুৎগতিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

মৃদু হেসে মনীশ বললে—"এই যে হরিহরবাবু, তারপর, ভাল আছেন ত? হঠাৎ এখানে কি মনে করে?"

ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো কেবল একটিমাত্র কথা—"শয়তান!"

পরের দিন সকালে নবগোপালবাবুর অফিস ঘরে নবগোপালবাবু এবং প্রভাত গাঙ্গুলি সামনাসামনি দুটো চেয়ারে বসে কথা কইছিলেন। আর একটা চেয়ারে বসেছিল মনীশ গুপ্ত।

নবগোপালবাবু মনীশের দিকে চেয়ে বললেন—"আচ্ছা, তুমি কি হরিহরবাবুকে গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছিলে?"

মনীশ বললে—"আজ্ঞে না, বরং ওঁর ওপর আমার গোড়ায় সন্দেহই হয়নি। ওঁর ওপর প্রথম সন্দেহ হলো সেই দিন, যেদিন রেস্তোরাঁর সেই কাল্পনিক লোকটির কথা আপনাদের কাছে বানিয়ে বলি। আপনার মনে আছে বোধ হয়, যেই আপনি আমার কাছ থেকে ভদ্রলোকের ঠিকানা লেখা কাগজের টুকরোটা চেয়ে নিয়ে ভদ্রলোকের নাম, ঠিকানা এবং ফোন্ নম্বর চেঁচিয়ে পড়লেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গেই হরিহরবাবু অসুস্থতার অছিলা করে ঘর ছেড়ে উঠে গেলেন। মনে পড়ছে বোধ হয় আপনার?"

"হ্যাঁ, খুব মনে পড়ছে। কিন্তু তা থেকে তাঁর ওপব সন্দেহ করবার কি আছে তা তো বুঝতে পারলুম না।"

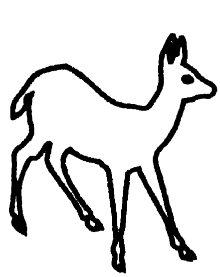
একটু হেসে মনীশ বললে—"ঠিক ঐরকম একটা কিছুই আমি আশা করেছিলুম। আমি জানতুম চায়ের দোকানের কাল্পনিক ভদ্রলোকটির ঠিকানা এবং ফোন্ নম্বর শোনামাত্রই আপনার তিনজন কর্মচারীর মধ্যে একজন না একজন ঘর ছেড়ে উঠে যাবেন। কারণ নাম, ঠিকানা এবং ফোন্-নম্বর, এতগুলো জিনিস একবার শুনে টাটকা-টাটকি মনে রাখা হয়ত কঠিন নয়, কিন্তু কিছুক্ষণ পর অতগুলো জিনিস গোল পাকিয়ে যেতে পারে; সুতরাং যদি কেউ ওগুলোকে কাজে লাগাতে চায়, তাহলে তার পক্ষে বুদ্ধিমানেব কাজ হবে তৎক্ষণাৎ বাইরে গিয়ে কোনো কাগজে বা খাতায় টুকে ফেলা, নয় কি?"

প্রভাত গাঙ্গুলি এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিলেন, এইবার আপন মনেই বলে উঠলেন—"সাবাস ছোক্‌রা!"

মনীশ বলে চললো—"আমি তখুনি বুঝেছিলুম, ভদ্রলোক কাল রাত্তিরেই ফোন করবেন। কেন না আপনার মনে আছে বোধ হয়, আমি আগেই জানিয়ে রেখেছিলুম, ভদ্রলোক কালই বম্বে চলে যাচ্ছেন।"

সব কথা শুনে নবগোপালবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর হঠাৎ একসময় বলে উঠলেন—"আমি যদি মনীশকে আমার কাছে রাখি, আপনার আপত্তি আছে কি প্রভাতবাবু? মাইনেটা যাতে ওর মতন প্রতিভাবান ছেলের উপযুক্ত হয়, সেদিকে অবশ্য আমার দৃষ্টি থাকবে।"

সিগারেটে একটা জোর টান দিয়ে প্রভাত গাঙ্গুলি বললেন,—"আমি কিন্তু ওকে ছাড়তে পারি না নবগোপালবাবু। ওর প্রতিভা আপনার মিউজিয়ামের জন্যে নয় নবগোপালবাবু, ওর প্রতিভার উপযুক্ত ক্ষেত্র ও পাবে আমার সঙ্গে কাজ করলে, নয় কি?"



# খেলার জগৎ

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

## ক্রিকেট : ছাই নিয়ে যুদ্ধ

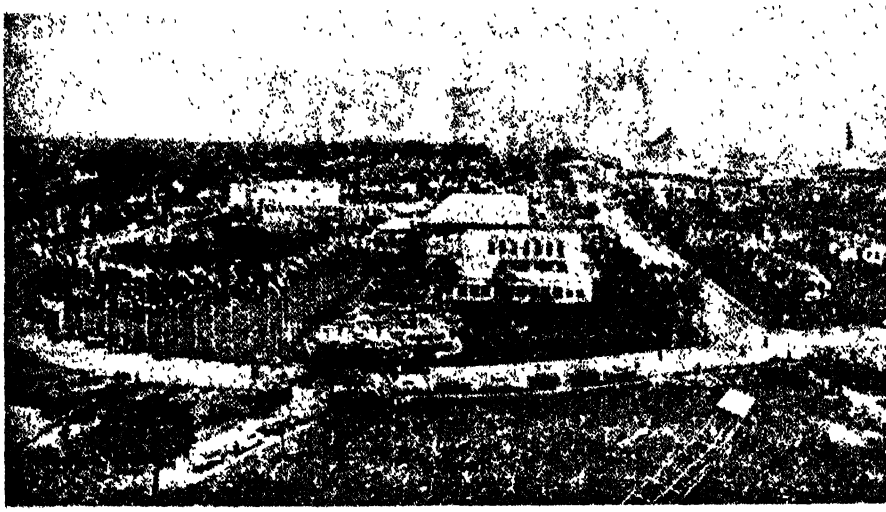
ওভালে অনুষ্ঠিত ইংলন্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার শেষ টেস্ট খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ায় এ বছরও 'এসেজ' রইল অস্ট্রেলিয়ার দখলে। ১৮৮২ সালে এই মাঠেই প্রথম ছাই নিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। আজ তোমাদের তার কথাই শোনাবো। ১৮৮২ সালের আগস্ট মাসে কেনিংটন-ওভাল মাঠে খেলা চলছে ইংলন্ডের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার। উইকেটের অবস্থা খুবই খারাপ। ব্যাট করতে নেমে ব্যাটসম্যানরা কোন মতেই সুবিধা করতে পারছেন না। টসে জিতে প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া করেছে মাত্র ৬৩ রান। ইংলন্ডের বোলার বার্লো (Barlow) একাই ১৯ রান দিয়ে নিয়েছেন ৫টি উইকেট। ইংলন্ড অস্ট্রেলিয়ার এই ৬৩ রানের জবাবে করলো ১০১ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ১২২ রান ওঠে অস্ট্রেলিয়ার। তাই ৮৫ রান করতে পারলেই জয়লাভ ঘটবে এই আশা নিয়ে দ্বিতীয় বার খেলতে নামলো ইংলন্ড। কিন্তু দুর্দান্ত বোলার মাসাস্ট আর সেন্টফোর্থের দাপটে শেষ পর্যন্ত ৭ রানের ব্যবধানে পরাজয় বরণ করতে হল ইংলন্ডকে। উলেট, গ্রেস, লুকাস, লিট্‌লটনের মত ব্যাটসমান থাকা সত্ত্বেও সেদিন ইংলন্ড কোনক্রমেই জিততে পারল না। ক্রিকেট খেলার ফলাফল সম্পর্কে যে আগে থেকে কিছুই বলা যায় না এই খেলাটি সে কথাই যেন নিশ্চিত ভাবে জানিয়ে দিল। অস্ট্রেলিয়ার কাছে ইংলন্ডের এই পরাজয় কতখানি বেদনায়ক তারই প্রমাণ পাওয়া যায় খেলার পরের দিন Sporting Time পত্রিকায় ছাপা এই খবরটির মধ্যে—

IN AFFECTIONATE REMEMBRANCE
OF
ENGLISH CRICKET
Which died at the Oval
on
29th August, 1882
Deeply lamented by a large
circle of sorrowing friends
and acquaintances
R. I. P.

N. B. the body will be cremated and the Ashes taken to Australia.

অর্থাৎ : ইংলিশ ক্রিকেটের প্রিয় স্মৃতির উদ্দেশ্যে গত ২৯ শে আগস্ট ১৮৮২ ওভাল মাঠে যার মৃত্যু হয়েছে।

পত্রিকায় প্রকাশিত এই শোক সংবাদটি থেকেই এসেজ শব্দটির উদ্ভব। এই ঘটনার পরের বছর আইভন ব্লী-এর অধিনায়কত্বে ইংলন্ড দল যখন খেলতে যায় অস্ট্রেলিয়ায় তখন মেলবোর্ন মাঠে একদল অস্ট্রেলিয়ান মেয়ে ক্যাপটেনকে পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণ উঁচু ছাই ভর্তি একটা মাটির পাত্র উপহার দেয়। এই ছাই ভর্তি পাত্রটি ইংলন্ডে নিয়ে যাবার জন্যেও অনুরোধ করা হয়েছিল তাঁকে। এই সিরিজেও অস্ট্রেলিয়া ইংলন্ডকে 'রবার' জয় করতে দেয়নি। পাত্র উপহার দেবার সেটাও ছিল একটা প্রধান কারণ। বর্তমানে সেই 'এসেজ' আছে M. C. C. এর তত্ত্বাবধানে।



অলিম্পিক গ্রামের উদ্বোধন উৎসবের দৃশ্য

## অলিম্পিক! অলিম্পিক!

আজ থেকে ৬৮ বছর আগে ফরাসী দেশের ব্যারন পীয়ের দ্য কুবার্তের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কয়েকজন ক্রীড়ামোদীর উদ্যোগে গ্রীস দেশের এথেন্সে প্রথম অলিম্পিক গেমসের আয়োজন করা হয়েছিল। সেইদিন এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাটিকে সাদরে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীরা। কিন্তু আরম্ভেরও একটা আরম্ভ আছে। ১৮৯৪ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক খেলাধূলা কংগ্রেসেই আধুনিক অলিম্পিক গেমসের খসড়া পরিকল্পনাটি প্রথম রচিত হয়। তারও আগে ১৮৯২ সালে কুবার্ত অনুরূপ একটি পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন তাঁর স্বদেশবাসীকে। তাই তাঁকেই আমরা আধুনিক অলিম্পিকের অন্যতম প্রধান রূপকার বলতে পারি। প্যারিসে অনুষ্ঠিত সভায় প্রথম স্থির হয় যে প্রতি চার বছর অন্তর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। সেই রীতি আজও চলে আসছে। প্রথমে এথেন্সে (অতীতে সেখানেই অলিম্পিকের খেলা হ'ত) ১৩টি দেশের মোট ২৮৫ জন পুরুষ এ্যাথলিট যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তী অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় প্যারিসে। ঐ প্রতিযোগিতায় ৬ জন মহিলাসহ মোট ১০৬৬ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। এযাবৎ ইউরোপে ১০ বার আমেরিকায় ৩ বার এবং অস্ট্রেলিয়ায় ১ বার অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছে। যে যে জায়গায় এই প্রতিযোগিতা হয়েছিল সেই সমস্ত স্থানের নাম যথাক্রমে সেণ্ট লুই, লণ্ডন, স্টক হোম, এন্টোয়ার্প, প্যারিস, আমস্টার্ডম, লস-এঞ্জেলস, বার্লিন, লণ্ডন, হেলসিঙ্কি, মেলবোর্ন ও রোম। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গণ্ডগোলে ১৯১৬, ১৯৪০ ও ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে অলিম্পিক গেমস বন্ধ রাখা হয়েছিল। যাই হোক ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত সপ্তদশ রোম অলিম্পিকের খেলাটি নানা কারণে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কারণ রোমের প্রতিযোগিতায় ৮৫টি দেশের ৫৯০২ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এর আগে আর কোন অলিম্পিকে এত বেশি খেলোয়াড় যোগ দেননি। কিন্তু ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিক রোমের সেই রেকর্ডকেও ম্লান করে দিয়েছে। টোকিওতে ৯৪টি দেশের প্রায় ৭০০০ জন খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করবেন। এছাড়া এশিয়ার বুকে সর্বপ্রথম অলিম্পিকের আসর বসছে জাপানে। এটাও কম গৌরবের কথা নয়। অক্টোবরের ১০ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে এই প্রতিযোগিতা। তার আগে সমস্ত দেশেই পড়ে গেছে সাজ সাজ রব। জাপানও পিছিয়ে নেই। তারা যে আয়োজন করেছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। তাই বলা চলে টোকিও অলিম্পিকের সাজ-সজ্জা, উৎসব-আয়োজন সমস্ত কিছু ছাড়িয়ে গেছে এর আগের ১৭টি অনুষ্ঠানকে। টোকিও অলিম্পিকের বাজেটটিও মনে রাখবার মত। প্রায় ২০ কোটি পাউন্ড অর্থাৎ ২৬০ কোটি টাকারও বেশী। এর আগে আর কোন গেমস-এ এত টাকা খরচ হয়নি।

[ আশ্বিন, ১৩৭১ ]

# গল্প শোনার গল্প

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি আমার জীবনে চারজন প্রথম শ্রেণীর গল্প বলিয়ের সাক্ষাৎ পেয়েছি। প্রথম আমার মা। যেমন বলতে পারতেন গল্প, তেমনি অফুরন্ত ছিল তাঁর ভাণ্ডার। অনেক গল্প আজও মনে আছে। আজও কানে বাজছে—

'কোথা গো মা কাজলহারা
মুছাও আমার অশ্রুধারা।
প্রাণে মারবে মুক্তাহারা
আসবে রাজা মিন্‌কোহারা
পত্নীহারা কন্যাহারা—
চোখের জলে ভাসবে ধারা।'

"রাজা মিন্‌কোহারা মস্ত রাজা। দুই রানী তাঁর, মুক্তাহারা আর কাজলহারা। মুক্তাহারার ছেলেমেয়ে হয়নি, কাজলহারার একটি মাত্র কন্যা—ননীর পুতলি, যেমন লাবণ্য তেমনি রূপ। মিন্‌কোহারা গেলেন দিগ্বিজয়ে। সুযোগ পেলেন মুক্তাহারা তাঁর সতীনের উপর হিংসা চরিতার্থ করবার। কাজলহারা কিন্তু অত্যন্ত সরল। তিনি দিদি বলেন মুক্তাহারাকে। ভক্তি করেন, বিশ্বাস করেন। সুযোগ নিলেন মুক্তাহারা, মিষ্ট কথায় কাজলহারাকে ডেকে বললেন, 'আয় কাজল তোর চুল বেঁধে দি।' কাজলহারা দিদির সমাদরে উৎফুল্ল হয়ে চুলের গুছি দড়ি নিয়ে ছুটে এসে বসলেন ছোট আদুরে মেয়েটির মত। মুক্তাহারা অবিকল সাপের মত আকার দিয়ে বাঁধলেন বেণী, তারপর একটি মন্ত্রপূত শিকড় তাঁর খোঁপায় গুঁজে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাজলহারা হয়ে গেলেন এক অজগর সাপ। অজগর হয়ে তিনি রাজপুরী থেকে বেরিয়ে নগরের প্রান্তে একটি গাছের কোটরে আশ্রয় নিলেন। পিছন পিছন তাঁর মেয়েটি এসে—সেই কোটরের ধারে বসে ঐ বলে কাঁদতে লাগল।"

এই গল্প। কিন্তু ওই যে রাজকন্যার কান্না—সে কান্নায় শ্রোতারা সকলেই দীর্ঘশ্বাস্ ফেলত, আমি কাঁদতাম। আজও আমার মনে আছে, তার সেই বিলাপের অবিকল শব্দবিন্যাস।

গল্প শেষে মা হেসে আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে একটি হিন্দি প্রবাদবাক্যে বলতেন—বলনেওয়ালা ঝুটা, শুননেওয়ালা সাচ্চা, অর্থাৎ গল্প যে বলে সে বলে মিথ্যা, কিন্তু যে শোনে সে শোনে সত্য।

নিত্য সন্ধ্যায় শুনতাম গল্প। যেদিন চুল বাঁধতে বসতে হত; সেদিন চুল বাঁধার সময় গল্প বলতেন।

'এক ছিল রাজা।
রাজার দুই মেয়ে।'

বলতেন সত্যপ্রিয়ের কাহিনী। সত্যই একমাত্র প্রিয় ছিল কুমারটির, শ্রেয়ই হয়েছিল তার প্রেয়। তারই কাহিনী থেকে পেতাম পথের নিশানা। সত্যই আমার পথ।

গল্পের শেষে মা বলতেন—

'কহনী হ্যায় সাচ্চা,
বলনেবালা ঝুটা,
শুননেবালা সাচ্চা।'

বলতেন—আমি বললাম বানিয়ে। কিন্তু তুমি সত্যি, আর গল্প সত্যি। গল্প তুমি কোনদিন ভুলবে না।

ছেলেবেলায় আমি যত গল্প শুনেছি, এত গল্প বোধ হয় খুব কম ছেলেই শুনতে পায়। আজ মনে পড়ছে, সেকালের গল্পগুলির মধ্যে, অন্তত আমি যাঁদের কাছে গল্প শুনেছি তাঁদের গল্পের মধ্যে আশ্চর্যভাবে এক প্রাণপুরুষের সন্ধান ছিল।

একালে অনেক পুরাকালের গল্প-সংগ্রহ বেরিয়েছে; 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' 'ঠাকুরমায়ের ঝুলি' আরও অনেক। এগুলির মধ্যে আমার শোনা গল্পগুলি পাইনি। এর কারণ বোধ হয় আমার শোনা গল্পগুলির উৎপত্তিস্থান বাংলা দেশ নয়। আমার প্রথম গল্প কথক আমার মা। তাঁর জন্ম পাটনা, মানুষও তিনি পাটনা শহরে। তিনি বলতেন যে সব গল্প, তার অধিকাংশই তিনি শুনেছিলেন তাঁর মায়ের ঝিয়ের কাছে। বলতেন—বুড়ী দাঈ। বুড়ী দাঈকে



মজার এই ছবিটি এঁকেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁর কি শ্রদ্ধা আর মমতা ছিল! ওই সত্যপ্রিয়ের কাহিনীর কথা এর আগে উল্লেখ করেছি; কাজলহারার কথা বলেছি। আর একটি গল্প তাঁর 'ঘাসেড়ানন্দনের গল্প।' ঘাসেড়ানন্দন শব্দটাতেই হিন্দী ভাষার গন্ধ আছে। তবে আমার মা তাকে আশ্চর্যভাবে আত্মসাৎ করে একেবারে বাঙালির গল্প করে তুলেছিলেন। এই সেদিনও, সেই গল্প তিনি আমার পৌত্রকে শোনাচ্ছিলেন। আমিও বসলাম পাশে। মা হাসলেন। আমার পিঠে হাত দিয়েই যেন আমাকেই বলতে লাগলেন। এক জায়গায় নানা খাবারের কথা আছে। তিনি বলে গেলেন—মল্লিকা ফুলের মত সাদা সুগন্ধ অন্ন, কাঁচা সোনার মত রঙের সোনামুগের ডাল, শাক, সুক্তো, দালনা, নানা রকমের ভাজা, ঝোল ঝাল অম্বল চাটনি, দই পায়েস ক্ষীর পিঠা, নানাবিধ মিষ্টান্ন রসগোল্লা, পান্তুয়া, সন্দেশ, চমচম, বরফি—অনেক নাম করে গেলেন। কিন্তু কোনটি বিহারের বিশেষ খাদ্য নয়। এই গল্পটির মধ্যে বড় হল বন্ধুপ্রীতি, সত্যপ্রীতি এবং বীর্যবানের বীর্য। রাজকন্যাও আছে, মায়াবিনী ডাকিনীও আছে, কিন্তু সে সব কিছুই মনে থাকে না। মনে থাকে, বন্ধুর কাছে সত্য গোপন করেছিলেন বলে মহাবীর ঘাসেড়ানন্দন তাঁদের বললেন—ভাই, তোমরা বন্ধু, তোমাদের ভোলা অসম্ভব, ভুলতে কখনই পারব না জীবনে। তবে ভাই, সত্য হল তার চেয়েও বড়। সেই সত্যকে আমার কাছ থেকে গোপন করেছ তোমরা; সুতরাং আজ থেকে বুকের বন্ধুত্ব বুকে রেখে আমরা পৃথক হলাম। যখন আহার করবো, তখন চারজনের আয়োজন করবো, চার পাতে সাজাবো, আগে তোমাদের তিনজনকে নিবেদন করে তবে নিজে খাবো। চারজনের মত আয়োজন যদি না জোটে, তবে যা জুটবে তাই চার ভাগ করে তিনভাগ তোমাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে আমি এক ভাগ খাবো। তিনভাগ বিতরণ করে দেবো দীনদুঃখীকে।

তিন বন্ধু চলে গেলেন একদিকে। তাঁরাও তাই স্বীকার করলেন। দোষ মেনে নিলেন। বললেন—এই মিথ্যা বলার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে যদি পারি তো দেখা হবে।

দেখা অবশ্যই হয়েছিল। এবং গল্প শোনার পরমানন্দের মধ্যে ওই কথা কয়টিই কানে বাজতো। ওই তো সেই প্রাণপুরুষের সন্ধানের রহস্যমন্ত্র!

[ কার্তিক, ১৩৭১ ]



# উমির ছড়া

বনফুল

ছাতের উপর পায়রা করে বকম্ বকম্
কইছে যেন কতই কথা হরেক রকম
হচ্ছে মনে বক্তৃতাতে দিচ্ছে যেন ছাত ভরিয়ে
তাই না শুনে মেঘেরা যেন চড়বড়িয়ে
    উঠল দিয়ে হাত তালি
    ওমা, দেখি ছাত খালি!
হুড়মুড়িয়ে পায়রাগুলো পালিয়ে গেল দলকে দল
ঝরঝরিয়ে বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টি পড়ে অনর্গল।

ছড়ারা ছড়িয়ে আছে আলো আর ছায়াতে
বহুদূর আকাশের তারা-ভরা মায়াতে
ঝুলছে ছড়ারা সব ছড়া ছড়া কলাতে
ফুল হয়ে পড়ে আছে শিউলির তলাতে
ঝরণার কুলুকুলু কলকল ছন্দে
ছড়ারা ছড়িয়ে পড়ে মনের আনন্দে।

বাবা আর দাদু আপিসেতে গেছে
    মাসীমণি উল বুনছে
দুদা আর উমা ও ঘরেতে বসে
    রেডিওর গান শুনছে।
    আমি বাড়ির ছোট্ট ঝি
    জিনিস পত্তর গুছোচ্ছি।

[ কার্তিক, ১৩৭১ ]



# পুতুল পুতুল

ভবানী মুখোপাধ্যায়

মা জানতে চাইলেন—কিরে রুবি আজ কি রকম বেড়ানো হল, চারুদিদি কতদূর নিয়ে গেল?

রুবি উৎসাহ ভরে—জবাব দেয়, কি সুন্দর একটা বেঁজী দেখলাম মা, ঐযে কেয়াগাছের ঝোপটা আছে না, ঐখান থেকে বেরিয়েই আমাদের দেখে পালালো। চারুদিদির কিন্তু হাতটা কেটে গেছে, এমন ভীতু ভয়ে কাঁটা ঝোপের ওপর পড়ে গিছ্‌ল।

—কোন্ কাঁটা ঝোপ?

—কেন ঐ যে কেয়াবনের পাশে! ঠিক যেন বেড়ালে আঁচড়ে দিয়েছে, এমন দেখাচ্ছিল মা চারুদিকে—

—আচ্ছা! বেচারি চারু ত আমাকে কিছু বলেনি। তোমার বাবা এইবার পুজোর সময় ও সব ঝোপ ঝাড় কাটিয়ে দেবেন।

—না, মা, আমার বেশ লাগে। মাঝে মাঝে কেমন ঘন ঝোপ। ঐখানেই রাঙাদির সঙ্গে লুকোচুরি খেলার মজা!

মা মন দিয়ে কথাটা শোনেন নি, আয়নায় মাথার চুলগুলো ঠিক করছিলেন।

রুবি আবার বলে—বাবা যদি জঙ্গলটা সাফ করিয়ে দেন তাহলে রাঙাদি বেচারি কি করবে? কোনও থাকবার, খেলা করবার জায়গা নেই ওর, চারুদির যখন হাতটা কেটে গেল রাঙাদির কি হাসি!

রুবির মার কানে এবারও কথাটা পৌছায় না। তিনি দাঁত দিয়ে কয়েকটা কাঁটা ধরে আছেন, কথা বলার উপায়ও নেই।

রুবি আবার বলছে—জানো মা, রাঙাদি এমন মজার মজার সব খেলা জানে, আর নাচতে পারে, কি বলব। জানো মা, ঐ যে মনসা আর ক্যাকটাস্ গাছের কাছে বাবা ছোট্ট একটা ফোয়ারা বানিয়ে দেন, একদিন সেই জলের দিকে তাকিয়ে দেখি, দুটো মুখ, যেন দুটো আমি, বলত-কি-? রাঙাদি,—তারপর চারুদি আসতেই রাঙাদি কোথায় চলে গেল, আমি একা একা বসে পাতার নৌকা জলে ভাসাতে লাগলুম।

বার বার রাঙাদির কথাটা কানে যেতে রুবির মা চুলের কাঁটাগুলি মুখ থেকে নামিয়ে বলে উঠলেন— কে তোমার রাঙাদি, খালি রাঙাদি রাঙাদি করছ?

—বারে, এতক্ষণ ত বললাম তোমাকে। রাঙাদি পুতুল। লাল টুকটুকে একটা বড় পুতুল, আমার চেয়েও বড়ো। প্রকাণ্ড পুতুল। কথা বলতে পারে না, আর ডলিপুতুলের মত শুয়ে পড়লে চোখটা বুজে যায় না।

—আমি ত জানি তোমার পুতুলের নাম তুলতুলি। রাঙাদি পুতুল আবার কবে হল?

—আরে তুলতুলিটাত' গেলবছর পুজোর সময় রণ্টুমামা দিয়েছিল, সে পুতুলটাত' ছোট জাপানি পুতুল। তুলতুলিকে শুইয়ে দিলে ওর চোখ বন্ধ হয়ে যায়। জানো মা, ওর পেটটা টিপলে কেমন গানের সুর শোনা যায়, খোকা ঘুমানোর মতো—তুলতুলি আমার খেলা ঘরের পুতুল। রাঙাদি তা নয়, ও বাইরের পুতুল। বাইরে থাকে, বাইরে খেলে, এমন সুন্দর টুকটুকে দেখতে মা—আমি না, ওকে পুজোর সময় আমাদের বাড়ি আসতে বলেছি—

রুবির মা ভাবলেন, তাহলে টুকটুকে রাঙাদি একটা মনগড়া পুতুল, পুজোর সময় চাই। তাই এখন থেকে তার জোগাড় করছে রুবি। এইবার ওকে একটা কোথাও ভর্তি করে দিতে হবে, সামনের পৌষে ও পাঁচে পড়বে। আর নয়। খালি পুতুল। মেয়েটা কেমন অদ্ভুত হয়ে উঠছে আশ্চর্য খেয়ালি, আপনমনে বকবক করবে, যেন কার সঙ্গে কথা বলছে, আবার ডাকো চুপচাপ। হাজার ডাকলেও সাড়া দেয়না। এদিক থেকে অনেকটা মার মত, মুখখানা আর গায়ের রঙটা কিন্তু একেবারে বাবার মত, পিতৃমুখী মেয়েরা নাকি সুখী হয়।

এই সব ভাবতে ভাবতে রুবির মা চিঠি লিখতে বসলেন। এখন থেকেই রুবির জন্য একটা ভালো জাতের স্কুল খোঁজা দরকার।

বাইরে ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। আশ্বিনমাস পড়ে গেছে, পুজোর আর পনের ষোলোদিন বাকি। বৃষ্টি থামার নাম নেই। রুবির বাবা সারাদিন খেটে খুটে বেশ পরিশ্রান্ত, ফ্যাক্টরিতে একটা নতুন জার্মান মেসিন বসছে।

রুবির মা বললেন —তুমি তাড়াতাড়ি হাত পা ধুয়ে নাও আমি একটু চা নিয়ে আসছি।

রুবির মা চা নিয়ে ফিরে আসতে রুবির বাবা আবার শুরু করলেন—ওঃ আজ যা খেটেছি, বুঝলে কেউ কিছু নয়, নিজের হাতে সব কাজ করা কি সম্ভব? অথচ আজকাল যা অবস্থা কেউ কিছু করতে চায় না, আর জানেই না কি যে করবে—!

রুবির মা বললেন—দেখ এবার পুজোর সময় মেন গেটের মুখটায় যে সব জঙ্গল আছে কাটতে হবে, তুমিও বলেছিলে ওসব আর রাখবে না—

বাবা বললেন—ওরে বাবা, ওযে একেবারে ভয়ানক হাঙ্গামা। মিলিটারিরা এ বাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেজকাকাবাবুর করে ফেলা উচিত ছিল। তিনি তখন হাত দিলেন না।

—তিনি জ্ঞানী লোক ছিলেন, তিনি ত আর এদেশে তারপর বাস করতে আসেন নি।

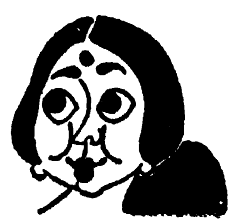
– অনেক বয়স হয়েছিল, শরীরও খারাপ হয়েছিল, কিন্তু এ সম্পত্তিটা যারা পাবে তাদের মুখের পানে তাকান প্রয়োজন ছিল।

—হয়ত ভাবেন নি, আমরা বোকার মত, এখানে এসে বাস করব।

রুবির বাবার মেজকাকী শেষবয়সে কাশীতে মারা যান, তারপর রুবিরা শিবনারায়ণপুরের এই বাড়িতে চলে এসেছে, কাছাকাছি একটা ফ্যাক্টরি বসিয়েছেন রুবির বাবা, সেখানে দিনরাত কাজ হয়, কত রকমের লোহার জিনিস ঢালাই হয়। রুবির মা তাই জানেন, এই পল্লী অঞ্চলে এসে বাস করার উদ্দেশ্যটা কি।

তিনি রুবির বাবাকে বললেন— তুমি অবশ্য একটা কাজ করতে পারো, তোমার ঐ কৃত্রিম ঝরণাতলার কাছটায় যে কেয়াবন আছে ওটা পরিষ্কার করে দিতে পারো। আজ আমাদের চারুর সঙ্গে খুকি ওদিকে বেড়াতে গিয়েছিল, কাঁটায় কাপড় জড়িয়ে না কি যেন কিসে চারুর শাড়ি ছিঁড়ে গেছে, হাত পা ছড়ে গেছে—





—তাহলে না হয় কালই উমাশংকরকে খবর দিই। লোকজন এনে চত্বরটা সাফ করে দিক। আচ্ছা এই ভর সন্ধ্যে বেলায় রুবি ওখানটায় কি করছিল, আমি ডাকতেই ছুটে পালালো।

—রুবি ওর ঘরেই ছিল, এই একটু আগেও আমার কাছে এসে চারুর পড়ে যাওয়ার গল্প বলছিল, ওকে ত রোদ্দুর থাকতে থাকতে ফিরে আসতে বলি—

—না, আমি তাই অবাক হয়ে গেলাম, সঙ্গে যেন আরো একটা মেয়ে, আমাব হাঁক ডাকে সেটাও পালালো।

—ও আব কি! হয়ত কোনো কাবখানাব লোকেব মেয়েটেয়ে হবে।

—তাই হবে। আশ্চর্য, একথাটা আমাব মনে হয়নি, একবারও।

চাযেব কাপটা শেষ কবে রুবিব বাবা বললেন—জাযগাটা সাফ-সুতরো কবে বাস কবাব যোগ্য কবতে অনেক খবচ পড়বে। তাবপব রুবিটা রুগ্ন, ওব যদি একটা ভাই থাকত—

— তাহলে অন্ততঃ ওর একটা খেলা কবাব সঙ্গী হত। কেউত নেই, কোথায যায—

—থাক্, যাই হোক, মেয়েটাব শবীবটা একটু ভালো হয়ে সাবলে হয। যা বোগা হচ্ছে দিন দিন।

রুবিব বাবা যা কখনও কবেন না, তাই কবলেন। আস্তে রুবিব ঘবে ঢুকলেন। চারু তখন রুবিকে রামেব বনবাসেব গল্পটা শোনাচ্ছিল। রুবিব বাবা বললেন—কি গো চারু? তোমাব নাকি কেযাবনে পড়ে গিয়ে হাত পা ছড়ে গেছে। কাপড় ছিঁড়েছে?

—না দাদাবাবু। অমনই কেমন মাথাটা ঘুবে গেল। তাবপব মনে হল কে যেন ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিল।

তাব মুখে চোখে একটা আতঙ্কেব ভাব লক্ষ্য কবলেন রুবিব বাবা। বললেন কালই আমি সব ঝোপ ঝাড় কাটাবাব ব্যবস্থা কবছি। তাহলে ওখান দিয়ে চলা ফেবাব অনেক সুবিধা হবে।

চারু বলল—সেই বেশ ভালো হবে, ঐ যে ঝবণা না কি আছে ওখানেই রুবি দিদিমণি দিনবাত ছুটে ছুটে যাবে, ওব ঐ জাযগাটাই বেশি পছন্দ।

রুবি সব শুনছে, মনে মনে সে বলে—রাঙাদিব কিন্তু এসব ভালো লাগে না। সে মোটেই পছন্দ কববে না, কি দবকাব বাপু, ওসব সাফ-কবাব। কিন্তু এদেব কাছে রাঙাদিব কথা বলা বৃথা। সে শুধু বলে—তাহলে কিন্তু বিচ্ছিবি হবে, ভাবি খাবাপ দেখাবে—

পবদিন উমাশংকব দল নিয়ে কাজ কবল। দুপুব পর্যন্ত কাজ কবেও আব কাজ এগোয না। একটা জাযগায বিশ্রী সব কঙ্কাল কিছু পাখিব পালক এই সব পাওযা গেছে। উমাশংকবেব বযস হযেছে, সে অনেকদিন এই অঞ্চলে আছে, সে বলল—এসব জন্তু-জানোযাবেব কাজ নয, এসব ডাকাত ফাকাতেব কাণ্ড।

বিকালেব দিকে চারু গিয়েছিল রুবিকে নিয়ে কতখানি জঙ্গল পবিষ্কাব হল দেখতে। উমাশংকব উৎসাহভবে বলে—কাজ ত আবো হত, ঐ হাড়গোড় বেবিযে পড়ে কাজটায ঢিল পড়ে গেল। রুবিদিদিমণি যেমনি তুমি এলে আমাব পা খানা কেটে গেল—

রুবি বিস্মিত তাব পাযেব দিকে তাকিয়ে থাকে।

যাই হোক্, যে জন্তুটা এই সব হাড়-গোড়েব জন্য দাযী, সে নিশাচব। কাবণ পবদিন সকালে দুটো বাজহাঁস মবে পড়ে আছে দেখা গেল। মাটিতে ববফেব মত শাদা পাখনাগুলো ছড়ানো। উমাশংকবেব দলেব মিহিলাল বলে—ওটা জন্তু টন্তু নয মোটেই, মানুষ। কেন না হাঁস দুটোব মুণ্ডুগুলো টেনে ছিঁড়ে নিযেছে।

কে একজন জঙ্গলেব ভেতব থেকে ছোট মেযেব এক গাছা কলঙ্ক ধবা পেতলেব বালা নিয়ে এল।

পথটা পবিষ্কাব হয়ে গেল। রুবি এখানে বেড়াতে এসে ঝবণাব কাছটিতে অনেকক্ষণ বসে বইল, তাবপব চারু একটু অন্যমনস্ক হতেই কাকে উদ্দেশ্য কবে বলে ওঠে—তুমি দুষ্টু, পাজি তুমি একটা পশু। আমি আব তোমাব সঙ্গে খেলবো না, পুজোব সময জামা-টামা কিছুই দেবনা।

এই বলে রুবি—জিভ্ দেখায।

চারু এমন সময এসে পড়ে সেই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে বলে—কি দিদিমণি! ওকি কবছো! তোমাব শবীবটা ভালো ত? রাঙাদি রাঙাদি কবে কি বলছিলে?

—রাঙাদিব নাম মুখে আনতে নেই, কিছু বলোনা যেন চারুদি।

সেই দিন বাতে রুবিব মা আব বাবা গেলেন জমিদাববাবুদেব বাড়ি ছেলেব অন্নপ্রাশনে। রুবিব মাকে ভাবি ভালো লাগছিল। সে বলে উঠল মা—তোমাকে বানীব মত দেখতে।

মা খুশী হয়ে বললেন—লক্ষ্মী হয়ে থাকবে। পুজোব সময তোমাকে ঠিক একটা রাঙাদি পুতুল কিনে দেব—

—না মা, রাঙাদি নয?

—কি আশ্চর্য কাণ্ড! এই ত ক'দিন আগে রাঙাদি, রাঙাদি কবছিলি!

রুবি শুখনো গলায বলে, না ওব সঙ্গে আমাব আড়ি হয়ে গেছে।

অনেক রাত হল ওঁদের নিমন্ত্রণ বাড়ি থেকে ফিরতে। গাড়িটা বাগানের মধ্যে ঢুকিয়ে খানিকটা যেতেই হেড লাইটের অলোয় দেখা গেল শাদা ফ্রক পরা দুটো মেয়ে যেন দৌড়ে পালাল।

আতঙ্কে শিউরে উঠলেন রুবির বাবা। কি আশ্চর্য! রুবি কি এই রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে নাকি!

তাড়াতাড়ি গাড়িটা বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে, রুবির বিছানায় গিয়ে দেখেন, বিছানায় রুবি নেই, ঘরদোর তোলপাড়। কি কাণ্ড! পুতুলগুলো সব ভাঙা-চোরা মুণ্ডহীন হয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

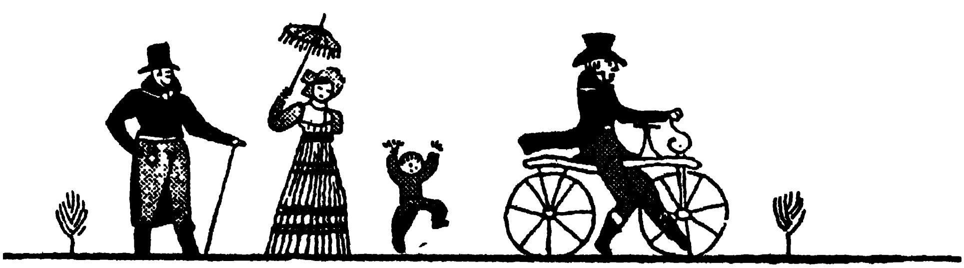
রুবির মা বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রুবি রুবি করে গলা ফাটাচ্ছেন, বুড়ি ঝি চারু ছুট্‌ছে এঘর ওঘর।

রুবির বাবা দৌড়লেন সেই কেয়াবনের পাশে, ঝরণার ধারে—যেখানে ফ্রক পরা দুটি মেয়েকে মিলিয়ে যেতে দেখেছেন।

টর্চের আলোয় শেষ পর্যন্ত রুবির সন্ধান মিলেছিল। দেহ থেকে মাথাটা টেনে কে খসিয়ে নিয়েছে: আর রাজ হাঁসের ঝরা পালকের মত তার ফ্রকের টুক্‌রোগুলো চারপাশে ছড়ানো।

চারু ঝি কখন এসে দাঁড়িয়েছিল পাশে রুবিব বাবা লক্ষ্য করেন নি, কাঁদতে কাঁদতে সে খালি বলতে থাকে—শয়তান রাঙাদির কাণ্ড, এ সব সেই রাঙাদির শয়তানি।

[ কার্তিক, ১৩৭১ ]



# বাহাদুর বটে

## বুদ্ধদেব বসু

সুপতি বলে যে-ছেলেটা হঠাৎ একদিন ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে এসে ভর্তি হলো তার সঙ্গে ক্লাসের ছেলেদের ভাব এখনো যেন ভাল করে জমলো না। চেহারাটাই তার কেমন বেখাপ্পা গোছের। লিকলিকে রোগা, লম্বা যেন তালগাছ, তার উপর মুখের ছাঁদ আর গায়ের রঙ অবিকল চীনেদের মতো। দেখতে সে অন্য কারো মতোই নয়; আর তার হাবভাব চালচলন এমন যে মানুষটাও সে অন্য কারো মতো নয়। ছেলেরা প্রথমটায় তাকে নিয়ে হাসি-তামাসা করতে গেছল, জুৎ হলো না। বিধু হচ্ছে ক্লাসের চাঁই ছেলে, সে চেয়েছিলো তাকে নিজের দলে ভিড়োতে, তা সুপতির ভাবখানা যেন বড়ই গম্ভীর। সে একা-একাই থাকে, দরকার না হলে কারো সঙ্গে কথা বলে না, পিছনের বেঞ্চিতে বসে থাকে মোটা মোটা ইংরিজি বই চোখের সামনে খুলে—পড়ে না লোক দেখায় ঈশ্বর জানেন। শোভন বলে যে-ছেলেটা এবারের অ্যানুয়েল পরীক্ষায় ফাস্ট হয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিলে, সে কিন্তু সুপতির দিকে আড়চোখে তাকাতে আরম্ভ করেছে। কে জানে, হয়তো দারুণ কিছু! এখন পর্যন্ত অবিশ্যি কোনোদিকেই সুপতির কোনো বিশেষত্বের নমুনা দেখা যায়নি, কিন্তু দেখা যায়নি বলেই তো ভয় বেশি। কে জানে ছেলেটা কোনদিকে কী করে বসে! কিছুই বলা যায় না।

ছেলেদের মধ্যে আড়ালে-আবডালে নানারকম কথা হয় ওকে নিয়ে। বিটকেল, বিষ্টুটা বলে, 'জানিসনে, ওর জন্ম কিনা হংকং-এ, তাই চেহারা ওর চীনেদের মতো'। অমনি বলে ওঠে অমূল্য, 'বাপরে—হং কং! কিঙ্ কং-এর পরেই।' অমূল্যর ফাজলামি করার সখ খুব, কিন্তু নিজের বুদ্ধিতে বেশি জোগায় না; বিষ্টু যা বলে তারই উপর টিপ্পনি কাটে আর হা-হা করে হাসে। বিষ্টু আরো বলে, 'ছেলেবেলায় সাঙ্কি টাঙ্কির শেকড় খেয়েছিলো, তাইতেই তো অত লম্বা হয়েছে।' অমূল্য পুতুলের মতো বলে ওঠে, 'সাঙ্কি-টাঙ্কি! তার চেয়ে ডাঙ্কি-মাঙ্কি বলো না—মানাবে ভালো।' বলে হাসতে-হাসতে গড়িয়ে পড়ে।

এ-সব হাসাহাসি সুপতির কানে যায় বইকি। তাই বলে সে কি চটে? আরে আশে-পাশে কোথায় কী হচ্ছে তা লক্ষ্য করবার ফুরসৎই তো তার নেই। বিষ্টুর দল মনে-মনে বলে উঃ, দ্যাখো না দেমাক! ভাবে, ঐ কিং কং খেতাবটা একদিন সকলের সামনে জাঁকজমক করে উপহার দিতে হবে; কিন্তু সুপতির চোখের দিকে তাকালেই ভালো ভালো রসিকতাগুলো যেন ধোঁয়া হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। এদিকে শোভনের ইচ্ছা ওর বিদ্যের দৌড়টা একবার মেপে নেয়; কিন্তু পড়াশুনোর কোনো কথা পাড়লে কিছু না-বলে সুপতি এমনভাবে হাসে যার মানে বোঝা দায়। এদিকে সেদিন হলো কী, ইংরিজির বিনোদবাবু পড়াতে-পড়াতে হঠাৎ থেমে গিয়ে পিছনের বেঞ্চির দিকে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন ঃ

'সুপতি, তোমার দুখানা বই-ই কি আইভানহো?'

সকলের চোখ গেলো সেদিকে। দেখা গেলো, আইভানহোর নিচে লুকিয়ে সুপতি কী আর একখানা বই পড়ছে। টিটকিরির হাসি উঠলো ক্লাসে।

কিন্তু সুপতি সোজা উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে বললে, 'না স্যর, আর-একখানা হচ্ছে আইজ অ্যাণ্ড নো আইজ।'

গম্ভীরভাবে বললেন বিনোদবাবু; 'ক্লাসের মধ্যে বসে নভেল পড়া কি ভালো হচ্ছে?'

'এটা নভেল নয়, স্যর,' বলে সুপতি বোধ হয় মুচকি হাসলো।

বিনোদবাবু আরো বেশি গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু পরে বললেন, 'ওটা রেখে দাও, আইভানহোর সতেরো পৃষ্ঠা খোলো।'

এর পর সুপতি যেন ক্লাসের ছেলেদের চোখে আরো কয়েক ইঞ্চি লম্বা হয়ে গেলো। আড়ালে যত তারা ঠাট্টা করে, মনে-মনে ততই হিংসে করে। শোভন তো একদিন জোর করেই বলে বসলো যে ওসব ওর বুজরুকি ছাড়া কিছু নয়, পাছে ধরা পড়ে যায়, সেই ভয়ে কারো সঙ্গে বেশি কথা বলে না। আসুক না হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষাটা, তখনই সব ফাঁস হবে।

কিন্তু তার আগেই যে এই সুপতি এমন এক হাত নেবে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

ব্যাপার হলো এই রকম। তাদের ক্লাসের নন্দ ইস্কুলের সেরা খেলোয়াড়, ক্রিকেটের ক্যাপ্টেন, ব্যাট চলে যেন আগুন। গেলো বছর বীরেশ্বরী কাপ্‌টা নিতে-নিতেও তারা যে কেমন করে রানী ভবানী হাই স্কুলের সঙ্গে হেরে গেলো সে এক অবাক কাণ্ড। এ-বছর তারা খুব ভালো তৈরি হয়েছে, স্টার একাডেমির কাছে এবার যে-দল এগুতে পারবে তাকে বাহাদুর বলতে হবে বটে। কয়েকদিন থেকে ছেলেদের মুখে এ ছাড়া কথা নেই। যারা যারা খেলবে, তারা খোদ সেকেন্দর শাহর মতো ক্লাস কামাই করে মাঠেই হাত পা ছুঁড়ছে, ভূগোলের পীতাম্বরবাবু আছেন সঙ্গে, তিনি এককালে অল্-বেঙ্গল ইলেভেন্-এর রিজার্ভে ছিলেন। উৎসাহের একেবারে বান ডেকেছে, পরশুই খেলা আরম্ভ, এমন সময় কিনা খবর এলো যে প্রাকটিসের মাঠে হঠাৎ পড়ে গিয়ে নন্দর ঠ্যাং গেছে ভেঙে, পনেরো দিনের মধ্যেও তার সেরে ওঠবার আশা নেই। হায়, হায়, নন্দ যে এবার সেঞ্চুরি করতো। তাদের আশা-ভরসা বলবুদ্ধি সবই যে ছিলো ঐ নন্দ। কী হবে এখন?

হেডমাস্টার থেকে আরম্ভ করে দরোয়ান পর্যন্ত সকলেই সমান বিচলিত। ছেলেরা তো কাঁদো-কাঁদো। খেলোয়াড়রা ধরে নিয়েছে এটা ঐ রানী ভবানীরই কোনো ছেলের কাণ্ড, যদিও তাদের মাঠের ত্রিসীমানাতেও রানী ভবানীর কোনো ছেলে ছিলো না। তাতে কী? নন্দর ঠ্যাং ভাঙলে ওদেরই জিৎ, সুতরাং ওরাই এটা করেছে। চক্রান্ত চলেছে ওদের কাপ্তেনের হাতের কব্জি এমনভাবে ভেঙে দেবার যাতে জন্মেও আর ব্যাট ধরতে না হয়। হেডমাস্টার সেটা জানতে পেরে খেলোয়াড়দের একত্র করে, ভালো ভালো উপদেশ দিচ্ছেন—ক্রিকেট হচ্ছে ক্রিকেট, মানে এতে খেলা জেতবার চাইতে ভদ্রভাবে ভালো করে খেলাটাই বড়ো কথা।

তা ছেলেরা কি অত সব শোনে। অতসব সাধের বীরেশ্বরী কাপ তাদের। এদিকে খেলার আর মোটে একদিন বাকি।

এত সব ব্যাপারের মধ্যেও সুপতি ছিলো উদাসীন হয়ে। কিছুই যেন তার গায়ে লাগে না। দেখে-দেখে বিধুর শরীরটা জ্বলে যায়। বিধু নিজে খেলে না, কিন্তু লেখাপড়া ছাড়া অন্য সমস্ত ব্যাপারে তার সব চেয়ে বেশি উৎসাহ। টিফিনের সময় যখন সে দেখলে বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে সুপতি লম্বা কোঁচা ঝুলিয়ে একটা একটা করে খোসা ছাড়িয়ে চীনেবাদাম খাচ্ছে তখন তার আর সহ্য হ'লো না। ছুটে গিয়ে বললে, 'তুমি তো দেখছি খুব নিশ্চিন্ত।'

'কেন, চিন্তিত হবার কী আছে?'

'নন্দর ঠ্যাং ভেঙেছে খবর রাখো? আমাদের এত বড়ো একটা ম্যাচ—'

'তা খেলা বুঝি হবে না?'

'খেলা তো হতেই হবে, কিন্তু নন্দকে না-হলে আবার খেলা কিসের। ইস্—বীরেশ্বরী কাপ্ এবার আমাদের কে মারে।'

'এর জন্যে এত ভাবছো কেন? আমি খেলবো, তাহলেই হবে,' বলে সুপতি কুড়মুড় করে একটা চীনেবাদাম ভাঙতে লাগলো।

বিধু তো হাঁ। খানিকক্ষণ কথাই নেই তার মুখে।

সুপতি আবার বললে, 'আমি খেলবো, তাহলেই হবে। ভেবো না তোমরা।'

'তুমি—খেলতে পারো?'

সুপতি মুচকি হাসলো।

'পারি একটু একটু। বম্বেতে ছিলুম কিনা, ক্রিকেট তো সেখানেই খেলা হয়। এখানে যা হয়—সে তো ছেলেখেলা।'

এ-কথা শুনে বিধুর দস্তুরমতো মাথা ঘুরে গেলো। ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে সুপতির মুখের দিকে তাকিয়ে বললে 'এ-কথা তুমি আগে বলোনি কেন?'



'ওঃ, এ আর একটা বলবার কী?' খুব তাচ্ছিল্যের সুরে বললে সুপতি।

কিন্তু বিধু হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললে, 'তাহলে আর দেরি নয়। চলো পীতাম্বরবাবুর কাছে এক্ষুণি!'

সুপতি দুপা পিছু হটে বললে, 'পাগল!'

'সে কী কথা! তোমাকে যে খেলতেই হবে। না—না, তোমার কোনো কথা শুনবো না, তুমি যে একজন অসাধারণ খেলোয়াড় তা তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি। আমার আগেই ভাবা উচিত ছিলো কথাটা। চলো, চলো,' বলে বিধু সুপতিব হাত ধরলো।

আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সুপতি বললেঃ 'আসল কথাটা তাহলে বলি তোমাকে। আমি বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি ম্যাট্রিক পাস না-করে আর ব্যাট ধরবো না।'

'সে কী কথা!'

'হ্যাঁ। খেলা নিয়ে বড্ড মেতে থাকতুম বলে বাবা প্রায়ই বকতেন। শেষটায় একদিন এমন রাগ হলো যে—'

'তাই বলে খেলা ছেড়ে দিলে?'

'তাতে আর কী? এখন পড়াশুনোয় মন দিয়েছি। না ভাই, তোমরা আমাকে মাপ করো।'

'ক্ষেপেছো? কাল তোমাকে খেলতেই হবে। শুনতে পেলে হেডমাস্টার মশাই-ই ছাড়বেন নাকি ভেবেছো? আমাদের ইস্কুলের মান-সম্মান এখন যে তোমারই হাতে।' উৎসাহের ঝোঁকে বিধুর মুখ দিয়ে বক্তৃতার ভাষা বেরুতে লাগলো। 'আমাদের এত বড়ো একটা বিপদ—আর তার কাছে তোমার ঐ প্রতিজ্ঞা! উঃ, ঐ রানী ভবানীর ষণ্ডারা তো কাল নাচতে-নাচতে আসবে। নন্দ খেলছে না, তাহলে আর ভাবনা কী? কিন্তু অবাক হয়ে দেখবে ওরা বম্বের খেলা! ওঃ, গ্র্যান্ড্ হবে। ওদের পিটিয়ে একেবারে ফ্ল্যাট করে দেয়া চাই কিন্তু,' বলে বিধু সুপতির পিঠের উপর এমন চড় মারলে যে সুপতি আর একটু হলেই 'উঃ,' বলে ফেলেছিলো।

বিধুর উৎসাহ একবার যখন ভালো করে জেগে ওঠে তখন আর কেউ তাকে ঠেকাতে পারে না। টানতে টানতে সে সুপতিকে নিয়ে তক্ষুণি হাজির করলো পীতাম্বরবাবুর কাছে। বললে, 'এই তো, সার, খেলোয়াড় ধরে

এনেছি, আর ভাবনা নেই। সুপতি বম্বেতে সব ভালো-ভালো ম্যাচে লম্বা স্কোর করে এসেছে, অথচ আমাদের কাছে কিচ্ছু বলেনি। দেখুন তো, স্যর, কী অন্যায়!'

সুপতি বলতে আরম্ভ করলো, 'আমার অনেকদিন প্র্যাকটিস নেই—'

কিন্তু কে শোনে ওর কথা! বিধু গড়গড় করে বলতে লাগলো, 'এ-সব ওর বাজে কথা, স্যর। চমৎকার ব্যাট্‌স্‌ম্যান, চেহারা দেখেই তো বোঝা যায়। ওঃ, রানী ভবানী যা জব্দটা হবে!'

পীতাম্বরবাবু বললেন, 'বিনয় ভালো, কিন্তু নিজের গুণ একেবারে গোপন করাও অন্যায় এ-কথা আমি বলবোই। সুপতি, তোমার অনেক আগেই টিমে ভর্তি হওয়া উচিত ছিলো। যাক্, কাল খুব ফুর্তিসে খেলে এসো তো। এখন আমার মনে হচ্ছে যে বীরেশ্বরী কাপটা এবার আমরাই নেব।'

নন্দর বদলে ক্যাপ্টেন হয়েছে শঙ্কর, সে বোলার, খুব যে ভালো খেলে তা নয়, তার চেষ্টা আছে আপ্রাণ। তক্ষুণি তাকে ডাকা হলো, গেলো সকলে মিলে হেডমাস্টারের কাছে, হেডমাস্টার তো সুপতির হাত ধরে ঝাঁকুনিই দিয়ে ফেললেন। ঠিক হলো, সুপতি হবে তিন নম্বর খেলোয়াড়, প্রথমে যাবে সুবোধ আর অশোক, ওদের একজন আউট হলে অবতীর্ণ হবে স্টার একাডেমির ব্র্যাডম্যান।

খবরটা তক্ষুণি সমস্ত স্কুলে ছড়িয়ে পড়লো। বিধু সগর্বে ঘুরে-ঘুরে বলে বেড়াতে লাগলো, বেচারা ঠ্যাং-ভাঙা নন্দকে তখনকার মত ভুলেই গেলো সকলে। শুধু বিষ্টুটা ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে, "ওরে বাবারে খোদ বোম্বাই ক্রিকেট, চালাকি নয়।' আর অমূল্য ফ্যা-ফ্যা করে হেসে উঠলো।

এদিকে হয়েছে কী, সুপতি তো জন্মেও ব্যাট ধরেনি। নিছক একটা কথার কথা বলে সে এমন বিপদে পড়বে কে জানতো! নিজেকে দোষ দেবার কথা তার একবারও মনে হলো না—ঐ ফোঁপর দালাল বিধুটাই তো যত নষ্টের গোড়া। আরে একটা কথা বলেছি বলে তক্ষুণি তা-ই করতে হবে নাকি? তার চাইতে বোবা হয়ে থাকলেই হয়। বাড়ি ফিরে এসে সুপতি না পাবে খেতে, না পাবে একটু আবাম ক'রে বসতে। যে-খেলার মক্সো করতে গিয়েই নন্দর মতো পাকা খেলোয়াড়ের ঠ্যাং ভাঙে, তাবই আসলটাতে তার একখানা হাড়ও যে আস্ত থাকবে না সে-বিষয়ে তাব কোনো সন্দেহ রইলো না। যাবে নাকি সে পালিয়ে আজ বাত্রেই হাজারিবাগ কি কটক কি কক্সবাজাব যেখানে হয়। ফিবে এসে বললেই হবে হঠাৎ মামাব টেলিগ্রাম পেলুম, শিকার করতে গিয়ে তিনি বাঘের হাতে জখম হয়েছিলেন—ওঃ, আস্ত একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার, ঠিক সময় বুঝে মাস্‌ল ফুলিয়েছিলেন বলেই বেঁচে গেছেন। কথাগুলো শুনতে শুনতে ছেলেদের মুখেব ভাব কেমন হবে সেটা ভেবে ওরই মধ্যে সুপতির মনে একটু আনন্দ হলো।

রাত্রে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখলো ভারি অদ্ভুত। মস্ত মাঠে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে, চারিদিকে হাজার হাজার লোক। সে নেমেছে ব্যাট হাতে নিয়ে, কিন্তু প্রথম বল্‌টা এসেই যেন তার মাথাটা উড়িয়ে নিয়ে চলে গেলো। তারপর বলের বদলে তাব মাথা নিয়েই খেলা চললো: তার মাথা মাঠে গড়াচ্ছে, তার মাথা বোঁ-বোঁ করে শূন্যে উড়ছে, আর চারিদিকে লোকের কী হাততালি!

সকালে উঠেই সে মন ঠিক করে ফেললো। আজকের মতো সে যাবে তো শিবপুরে পালিয়ে—সেখানে তার এক পিসী থাকেন। উপস্থিত ফাঁড়া কাটুক তো, তারপর উপস্থিত বুদ্ধিমত যা মুখে আসে বলা যাবে।

যথাসাধ্য পেট ভরে রুটি-মাখন আর চা খেয়ে, একখানা কাপড় ভাঁজ করে খবরের কাগজে জড়িয়ে নিয়ে সে কেবল বাড়ি থেকে পা বাড়িয়েছে এমন সময় বিধু আর শঙ্কর দুদিক থেকে এসে তার দু হাত ধরলো। পলকের জন্য সুপতির মুখ শুকিয়ে গেলো—ওৎ পেতো ছিলো নাকি ওরা?

বিধু বললে—'এত সকালেই কোথায় বেরুচ্ছো?'

সুপতি চট্ করে বললে—'যাচ্ছিলুম ভাই একটু সাঁতরাতে পদ্মপুকুরে।'

বললে শঙ্কর—'রোজই সাঁতার কাটো বুঝি?'

'তা না-হলে স্বাস্থ্য হবে কেন?' মুচকি একটা হাসলো সুপতি।

'বেশ, বেশ,' বিধু তার হাত ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিলে। 'এগারোটায় খেলা আরম্ভ মনে আছে তো? দশটার মধ্যে যাওয়া চাই তোমার।'

'তা দেরি আছে তো এখনো।'

'দেবি আব বেশি কী? চলো তোমাব সঙ্গে যাই পদ্মপুকুবে, তোমার সাঁতবানো দেখি। তারপব একসঙ্গেই যাবো মাঠে। তোমাকে না দেখলে ওদেব উৎসাহই হবে না।'

সুপতি বলে উঠলো: 'ঐ যাঃ। সেদিন বুকে কী-বকম একটা ব্যাথা হলো, ডাক্তাব বাবণ কবেছিলো কযেকদিন সাঁতাব কাটতে। ভুলেই গিযেছিলুম।'

বিধু তাড়াতাড়ি বললে, 'তাহলে আজ থাক্ ভাই, ও-সব সাঁতার-টাতাব এখন না কাটলে।'

শঙ্কব বললে, 'হ্যাঁ, খেলাব আগে আবাব তোমাবও—'

'পাগল।' সুপতি হেসে উঠলো, 'ডাক্তাববা তো ও-বকম কতই বলে। সব মেনে চলতে গেলেই হযেছিলো।'

কিন্তু ওবা তাকে সাঁতবাতে যেতে দেবেই না। অগত্যা সুপতি বললে—'চলো তাহলে আমাব ঘবে গিযেই একটু বসি।'

'ঐ কাগজে জড়ানো ওটা সুইমিং কস্টুম বুঝি?'

'হ্যাঁ। তা চলো তাহলে একটু বসি গিযে।'

ওব ঘবে বসে শঙ্কব আব বিধু বাজ্যেব খেলাব গল্প জুড়ে দিলে। সুপতি এমনভাবে তাতে যোগ দিলে যেন ফুটবল ক্রিকেট টেনিস ছাড়া পৃথিবীতে আব কোনো জিনিসেই তাব মন নেই। কিন্তু ভিতবে ভিতবে তাব শবীবটা থেকে-থেকেই এমন বিশ্রীভাবে কেঁপে উঠছিলো যেন এক্ষুণি একশো তিন ডিগ্রি জ্বব আসবে। আব উপায নেই।

খেলা আবম্ভ হযেছে। স্টাব একাডেমি টস্-এ জিতেছে, সুবোধ আব অশোক গেছে ব্যাট হাতে নিযে। ভিড মন্দ হযনি, দুই ইস্কুলেব ছেলেবা মাস্টাব মশাইবা, তাছাড়া বাইবেব লোকও কিছু আছে। শীতেব বোদ্দুবে ঝকঝকে বেলা।

স্টাব একাডেমি আবম্ভ কবলে ভালো। দুজনেই টুকটাক পেটাচ্ছে। এগাবো দৌড কবে সুবোধ আউট হযে গেলো। এবাব আসবেন ডন্ ব্র্যাডম্যান।

সুপতি যথাবীতি সাদা প্যান্ট পবেছে, গলা-খোলা সাদা সার্ট আব কেড্‌স্, দেখাচ্ছিলো তাকে বেশ ভালোই। হাতে দস্তানাও পবলে, কিন্তু প্যাড আঁটবাব সময তাব পা দুটো ঠকঠক কবে যে কাঁপতে আবম্ভ কবলো, সে আব থামেই না। অতি কষ্টে তো শক্ত হয দাঁড়িযে হাতে নিলে ব্যাট। বুক তাব ধডফড কবছে, গলাটা আসছে বুজে, চোখে ভালো কবে কিছু দেখছে না।

ঈশ্ববেব দযায় এক বল্-এই আউট হযে যায তাহলেই হয। ঈশ্ববেব দযায হাত পা গুলো আস্ত থাকে তাহলেই হয। ব্যাট দোলাতে-দোলাতে সে তো চললো উইকেটেব দিকে, স্টাব একাডেমিব দল উৎসাহে হাত তালি দিযে উঠলো। হাত-তালিব শব্দ থামলো, কিন্তু তাব কানেব কাছে একটা পিঁ—পিঁ—আওযাজ কিছুতেই থামছে না কেন?

ব্যাটেব উপব ঝুঁকে পডে খুব কাযদা কবে তো সে দাঁড়ালো। বেডি? তাবপব সুপতি হঠাৎ দেখলো লাল একটা আগুনেব গোলা বিদ্যুতেব বেগে তাব দিকে ছুটে আসছে। চোখ বুজে দু হাতে ব্যাট তুলে সে প্রাণপণে মাবলে বাড়ি। পবমুহূর্তেই হাত-তালিব শব্দে তাব কানে তালা লেগে গেলো। কী ব্যাপাব? বাউন্ডাবি হযেছে। যাঁা? পিঠ বেযে তাব দবদর কবে ঘাম নামলো। কিন্তু ভাববাব সময নেই, ঐ আসছে আবাব আগুনেব গোলা। ঠাস্ কবে একটা শব্দ হলো, হাত-তালি, চীৎকাব, ওবা সব পাগল হযে গেলো নাকি? ওভাব বাউন্ডাবি। সুপতি চোখে ঝাপসা দেখছিলো, চোখ দুটো একবাব মুছে নিযে আবাব ব্যাট ধবে দাঁড়ালো। আবাব এলো বল, আবাব ওভাব বাউণ্ডাবি। বাস্‌বে, কী চীৎকাব। থামেই না। তাব পবেব বলটা হঠাৎ যেন লাফিযে একেবাবে আকাশে উঠে গেলো, তাব মুণ্ডুটাই কি উডে গেলো, নাকি বলটাই আকাশ থেকে পডছে, সুপতি তা বুঝতে পাবাব আগেই একজন খপ্ কবে সেটা ধবে ফেললো। এবাব হাত-তালি উঠলো অন্যদিক থেকে।

যাঁা? আউট? বাঁচা গেছে। কপালেব ঘাম মুছে সে ফিবে এলো, তবু কি শান্তি আছে? পীতাম্ববাবু ঝাঁকাচ্ছেন হাত ধবে, হেডমাস্টাব ঝাঁকাচ্ছেন হাত ধবে, আব বিধু তো স্ফূর্তিব চোটে একটা ডিগ্‌বাজিই খেযে ফেললো। ওঃ কী স্টাইল। স্কোর না-হয বেশি ওঠেনি, তাতে কী। দৈবাৎ ঐ ক্যাচটা না উঠলে কী হতো ভাবো দিকি।

সবশুদ্ধ স্টার একাডেমি কবলে ষাট, পিছনেব খেলোযাড়বা চটপট পডে গেলো কিনা। বানী ভবানীব দল সাতজনে সাতচল্লিশ কবলে, কিন্তু তাব পবেই বেলা পডে গেলো, আব খেলা হয় না। কাজে-কাজেই আজকেব মতো ড্র হলো, আবাব খেলা হবে।

তিন ঘণ্টা সমানে ফ্যাগ্ খেটে সুপতির ততক্ষণে প্রত্যেকটি হাড় যেন খুলে আসছে। এবার সে বাড়ি গিয়ে শুতে পারলে বাঁচে। বল ধরতে গিয়ে হাতে চোট লেগেছে বিস্তর, আছাড় খেয়েছে, বলের পিছনে দৌড়তে-দৌড়তে জিভ বেরিয়ে এসেছে। তবু কি রেহাই আছে! ঐ আবার বিধুটা তাকে পাকড়েছে আবার খেলা হবে সাতদিন পরে, এ-কদিন খুব কষে প্র্যাকটিস করা চাই। সুপতি যদি কয়েকটা দিন ঝালিয়ে নেয় তাহলে তার সামনে দাঁড়াতে পারবে রানী ভবানীর কোনো বোলার! চাইকি সামনের ম্যাচে তাকেই ক্যাপ্টেন করে দেয়া যাবে। আজ অবিশ্যি সে চট্ করে আউট হয়ে গেলো, কিন্তু সে যে একজন অসাধারণ খেলোয়াড় তা তো ঠিক। ব্যাট্ ধরবার কায়দা দেখলেই তো বোঝা যায়!

পরের দিনই সুপতি ট্র্যান্সফার নিলে।

হেডমাস্টার কত বোঝালেন, কত সাধলেন, কিন্তু সুপতি অচল। 'বাবা আমাকে এলাহাবাদে পাঠিয়ে দিচ্ছেন স্যার, কলকাতায় স্বাস্থ্য ভালো থাকে না।'

এদিকে বিধু তিন-তিনবার তাব বাড়িতে এসে ঘুরে গেলো—সুপতি বাড়ি নেই।

দেয়ালির রাত্রে আলো নিবে গেলে যেমন লাগে, ওদের মনের ভাব অনেকটা সেই রকম হয়ে গেলো। শঙ্কর বললে—নিশ্চয়ই অন্য-কোনো ইস্কুল ভাগিয়ে নিয়েছে। হয়তো রানী ভবানীই—কে জানে!'

বিধু বললে—'ইস্, সাহস কত! তাহলে রানী ভবানীর একখানা ইটও আস্ত রাখবো নাকি? কে জানে বুঝি আবার বম্বেতেই চলে গেলো খেলতে।'

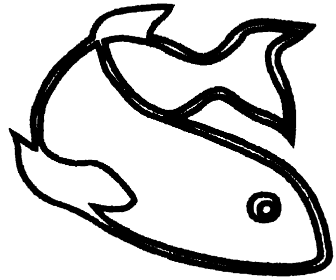
শোভন বললে, 'হ্যাঁঃ! চলে গেলেই হলো কিনা। সামনের বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে না!'

'আরে ওর আবার পড়াশুনো কী! হয়তো বম্বে থেকে বিলেতেই চলে যাবে টেস্ট্ খেলতে কে জানে!'

এমন কি বিষ্টু পর্যন্ত বললে ঃ 'আরে বম্বে গেছে না হাতি! আছে এখানেই, একদিন এসে হাজির হবে ঠিক। দাম বাড়াচ্ছেন—বুঝলে না?'

কিন্তু সুপতিকে ওরা কেউ আর দ্যাখেনি। কলকাতায় কি অন্য কোথাও সে আর খেলেছে এমন খবরও পায়নি কেউ। বিধু এখনো অবাক হয়ে মাঝে-মাঝে ভাবে—তাইতো। এমন চমৎকার একটা খেলোয়াড়, তার হলো কী? তাইতো।

[ কার্তিক, ১৩৭১ ]



# তিন বন্ধুর কাহিনী

## বিশু মুখোপাধ্যায়

তিন বন্ধু ছিল—অমল, কমল আর বিমল। অমল ছিল খুব মোটা—এত মোটা মানুষ কেউ কখনও চোখে দেখেনি। কমল ছিল তেমনি রোগা। মানুষ যে তালপাতার সেপাই-এর মত রোগা হতে পারে, এ কথা কেউ ভাবতেও পারে না! আর বিমল ছিল মাঝারি ধরনের—বেশ মাপসই চেহারা।

তিন বন্ধুতে খুব ভাব। সারাদিন একসঙ্গে বেড়ান, গল্প করা, খাওয়াদাওয়া সবই তারা একসঙ্গে করত—কেউ কারুকে ছেড়ে থাকতে পারত না। আজ পর্যন্ত কখনও তাদের ছাড়াছাড়ি হয়নি। এক দণ্ড কেউ আলাদা থাকলে অপর দুজনের প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত। কেবল রাত্রিবেলা যে-যার বাড়িতে শুতে যেত—ছাড়াছাড়ি যা হত তা কেবল সেই সময়েই।

তিনজনেই অবস্থাপন্ন লোকের ছেলে, কাজেই কোন কিছুর অভাব তাদের কারুকেই ভোগ করতে হত না।

দিনগুলি বেশ সুখেই মনের আনন্দে কাটছিল তাদের। একদিন বেশ একটা মজার ঘটনা ঘটল।

তারা মাঝে মাঝে এক-একদিন তিনজনে মিলে শিকার করতে বেরুত। এমনি একদিন তিনজনে শিকার করতে বেরিয়েছে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে এক জায়গায় তারা একটি পুরোন মন্দির দেখতে পেল। গাছপালায় ঢাকা এই মন্দিরটার মধ্যে কি আছে দেখবার জন্যে হঠাৎ তাদের মাথায় খেয়াল চাপল। তিন বন্ধুতে মিলে তখুনি জঙ্গল পরিষ্কার করতে লেগে গেল।

সূর্য যখন ডুবু-ডুবু তখন জঙ্গল পরিষ্কার করে তারা দেখল, ভিতর থেকে মন্দিরের দরজাটা বন্ধ। তখন তাদের মনে হল, হয় মন্দিরের মধ্যে কেউ আছে, অথবা অনেক দিন না খোলাখুলির জন্যে দরজাটা ভীষণ শক্ত হয়ে এঁটে গেছে।

অনেক ঠেলাঠেলির পর দরজাটা খুলে গেল। তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত পা-পা করে এগুতে আরম্ভ করেছে। দরজাটা খুলে যেতেই তারা অবাক হয়ে দেখলে, মন্দিরের মধ্যে কি যেন দুটো আলোর ভাঁটার মত জ্বলছে।

এখানে আলো কোথা থেকে এলো এই কথা ভেবে তারা মন্দিরের ভেতরে ঢুকে এগিয়ে চললো। একটু কাছাকাছি যেতেই বোঝা গেল ওটা আলো নয়, মানুষেরই দুটি চোখ, আলোর মত দেখাচ্ছিল দূর থেকে।

একটু লক্ষ্য করতেই তিনজনে দেখল, একজন লোলচর্ম অশীতিপর বৃদ্ধ সন্ন্যাসী স্থিরনেত্রে চেয়ে বসে আছেন। ওরা তাঁর আরও কাছে যাবে কিনা ভাবছে, এমন সময় তিনি হাতের ইঙ্গিতে ওদের বসতে বললেন।

রাত্রি কাটাবার মত আশ্রয় পেয়ে ওরা খুবই খুশি হল। তিন বন্ধুতে তখন পা টিপে-টিপে এক কোণে গিয়ে বসল।

এমনি ভাবে চুপটি করে তিনজনে বসে বসে রাত প্রায় এক প্রহর হয়ে গেল। তিনি কোন কথাও বলেন না, আর ওরাও সাহস করে তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারে না। সে এক অস্বস্তিকর অবস্থা!

সারাদিন শিকারের পিছনে ছুটোছুটি করে ওদের তখন ক্ষিদেও পেয়েছে যেমন, ঘুমও পেয়েছে তেমনি। ক্রমশঃ ঘুমে তাদের চোখ জড়িয়ে এলো—শেষে এক সময় তারা তিন জনেই সেইখানে মাটির ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সারারাত কোথা দিয়ে কি ভাবে যে কেটে গেল কেউই জানে না। হঠাৎ ভোরের দিকে মন্ত্র পাঠের আওয়াজে অমলের ঘুম ভেঙে গেল। অমল দেখল, সন্ন্যাসী ঠাকুর পদ্মাসন করে বসে মন্ত্রপাঠ করছেন। অমল তার আর দুই বন্ধুকে জাগালো।

তিনজনে উঠে বসার পর হঠাৎ তাদের ইচ্ছে হল, এই রকম একজন সাধক সন্ন্যাসীকে যখন পাওয়া গেছে, তখন তার কাছ থেকে কিছু-না-কিছু আদায় করতেই হবে!

এই বলে তিনজনেই তারা সন্ন্যাসীর সামনে হাঁটু গেড়ে জোড় হাত করে বসল।

সন্ন্যাসীর মন্ত্র পাঠ শেষ হলে, তিনি চোখ চেয়ে তাদের তিনজনকে এই অবস্থায় দেখে খুশি হলেন এবং

বললেন, আমি তোমাদেব তিনজনকে তিনটি বব দিচ্ছি, তোমবা এই তিনটি ববে তোমাদেব বাডিব কাছাকাছি যে কোন পুকুবে ডুব দিযে উঠে একবাবেব জন্য যা মনে কববে, তাই হবে।

অন্তর্যামী সন্ন্যাসীকে প্রণাম কবে খুশি মনে, এবাব তারা বাড়ি ফেবাব জন্য বওনা হল।

বাডিব কাছাকাছি এসে একটা পুকুবেব ধাব দিযে যাবাব সময সন্ন্যাসীব ববেব কথা তাদেব মনে হল। তখন সেখানে থমকে দাঁডিযে অমল বললে, আমি ভাবছি, ডুব দিযে আমি বব চাইব, আমি যেন বোগা হয়ে যাই।

কমল সঙ্গে সঙ্গে বললে, আমি ডুব দিযেই একমনে বলব, আমি যেন মোটা হয়ে যাই।

অমল ও কমল দুজনে তখন বিমলকে বললে, আমবা তো এই বব চাইব, কিন্তু তুমি কি বব চাইবে, বিমল?

বিমল মুচ্‌কি হেসে জবাব দিলে, আগে তোমাদেব হোক দেখি, তাবপব আমি যা হোক একটা বেছে নেবো।

অতঃপব প্রথমেই অমল পুকুবে নামল। ডুব দিযেই একমনে সে বললে, আমি যেন বোগা হযে যাই।

জল থেকে উঠে আসতে আসতেই দেখা গেল, সত্যিই অমল খুব বোগা হযে গেছে। এত বোগা যে অমল বলে চেনাই যায না!

তাবপব ডুব দিল কমল। সেও একমনে বললে, আমি যেন মোটা হযে যাই।

ডুব দিযে উঠে আসতেই দেখা গেল, সন্ন্যাসীব বব কমলেব বেলাতেও ফলেছে সত্যি হযে—বেশ মোটা হযেছে গেছে কমল। এত মোটা যে কমল বলে চেনাই যায না।

অমল ও কমল এবপব বাব বাব বিমলকে বললে, তুমিও এবাব যাও ভাই, একটি বব চেযে নাও।

কিন্তু বিমল বাজি হল না। সে বললে, এত দামী ববটা এখুনি চেযে নেব না একটু ভেবে চিন্তে চাইব।—একটাই তো বব, নিলেই ফুবিযে যাবে।

যাইহোক তাবা তিনজনে এইবাব বাডিব দিকে বওনা হল।

একটা তেমাথা বাস্তাব মোডে এসে অমল গেল পুবে, কমল উত্তবে আব বিমল পশ্চিমে।

অমল তাদেব বাডিব সদব দবজাব কাছে যেতেই দবওযান তাকে পথ আটকে দাঁডাল। প্রশ্ন কবল, কাকে চাই?

অমল বললে, আবে, আমি অমল—ভিতবে যাব।

কিন্তু দ্বাবী কিছুতেই শুনতে চাযনা তাব কথা ববং সে অমলেব উপব তম্বি-তম্বা আবম্ভ কবলে। গেটেব কাছে এই গোলমাল শুনে অমলেব মা, বাবা ও বাডিব আব সবাই একে একে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

অমল নিজেব পবিচয দিতেই তাবা সকলে হেসেই খুন। বললেন, তুমি কেমন কবে অমল হবে, অমল আমাদেব খুব মোটাসোটা—আব তুমি তো একেবাবে বোগা ডিগডিগে।

কিছুতেই তাঁবা আব অমলকে বাডি ঢুকতে দিলেন না।

কমলেবও ওদিকে একই অবস্থা। সেও বাডিতে প্রবেশাধিকাব পেল না চেহাবা বদলে যাওয়াব জন্যে।

তারও বাবা-মা বললেন, তুমি কেমন কবে কমল হবে বাছা—কমল আমাদেব খুবই বোগা, আব তুমি তো হাতিব মত মোটাসোটা ধুম্‌সো।



*মনের দুঃখে তারা দুজনেই ফিরে গেল। গিয়ে, সেই পুকুরের পাড়ে বসে দুজনে অনেক পরামর্শ করল, শেষে ঠিক করল বিমলের সঙ্গে দেখা করবে।*

বিমলের বাড়িতে গিয়ে অমল আর কমল উপস্থিত হতেই বিমল খুব অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল, কি রে তোরা এখনো দুজনে বাড়ি যাসনি?

অমল কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে, কি করব বল ভাই, আমাদের দুজনের কারুকেই বাড়ি ঢুকতে দিলে না, এমন কি বাবা-মা পর্যন্ত চিনতে পারলেন না—এখন এ বিপদ থেকে কি করে বাঁচি তাই বলো?

বিমল একটু ভেবে নিয়ে বললে, কি ভাগ্যি আমি আমার বরটা খরচ করে ফেলিনি—করলে কি বিপদ হত বল তো? চল, এবার আমার বরটা কাজে লাগাই। এই কথা বলে, ওদের দুজনাকে সঙ্গে নিয়ে তিন বন্ধু আবার সেই পুকুরের পাড়ে গেল। তারপর বিমল পুকুরে ডুব দিয়ে এক মনে বললে, আমার দুই বন্ধু আগে যেমন ছিল আবার যেন তেমনি হয়ে যায়।

সন্ন্যাসীর বরের গুণে দেখতে দেখতে আবার অমল রোগা থেকে মোটা হয়ে গেল, আর কমল মোটা থেকে হয়ে গেল আগের মত রোগা!

তিন বন্ধু তখন পরস্পরে মনের সুখে গলা-জড়াজড়ি করে বাড়ি ফিরে গিয়ে, আগের মত আনন্দে দিন কাটাতে লাগল।

[ কার্তিক, ১৩৭১]



# ভয় নাই

## শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের কথা। তখন ট্রেনে এত ভিড় হত না। ইন্টার ক্লাসের টিকিট কিনলে আরামে হাত-পা ছড়িয়ে যাওয়া যেত। অবশ্য ছুটিছাটার সময় একটু ভিড় হত বটে, কিন্তু এখনকার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না।

একবার বড়দিনের ছুটির শেষে অরবিন্দ কলকাতা যাচ্ছিল। তার বাড়ি দেওঘরে, কলকাতায় সে পড়ে। সবে কলেজে ঢুকেছে; বয়স সতেরো বছর। বেশ স্বাস্থ্যবান ছেলে; তার ওপর ফুটবল হকি খেলে শরীর বেশ মজবুত করেছে। মনটাও তার বেশ সহজ সবল আর সুস্থ।

শীতের রাত্রে জশিডি জংশনে দাঁড়িয়ে সে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিল। রাত্রি প্রায় পৌনে বারোটা; হাড়-কাঁপানো শীত। কিন্তু অরবিন্দর বেশী শীত করে না। সুতি কামিজের ওপর আলোয়ান গায়ে দিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল। তার সঙ্গে ছিল একটা ছোট সুট-কেস আর ট্রেনে ব্যবহারের জন্য কম্বলে জড়ানো একটা বালিস। বিস্তৃত ইস্টিশানের চারিদিকে লাল সবুজ হলদে নানারঙের আলো অরবিন্দকে ঘিরে যেন রূপকথার কল্পলোক সৃষ্টি করেছিল।

দূরে লাইনের ওপর একটা তীব্র আলোর বিন্দু দেখা গেল। গাড়ি আসছে। আলোর বিন্দু ক্রমে বড় হতে লাগল! তারপর হেড লাইটের তীব্র ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে ট্রেন গম্‌গম্‌ শব্দে ইস্টিশনে এসে দাঁড়ালো।

একটা ছোট ইন্টার ক্লাস কামরা অরবিন্দর ঠিক সামনে এসে থেমেছিল। অরবিন্দ বন্ধ জানালার কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখল, কামরার দুটো বেঞ্চি খালি, কেবল মাঝেরটায় একটা লোক আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। অরবিন্দ আর দ্বিধা না করে সেই কামরায় উঠে পড়ল।

পাশের একটা বেঞ্চির ওপর কম্বল পেতে অরবিন্দ বিছানা তৈরি করে ফেলল; সুটকেসটা মাথার ওপর বাঙ্কে তুলে দিয়ে সে আরাম করে বিছানার ওপর বসল। মাঝের বেঞ্চিতে যে লোকটা কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল, সে মুখ খুলল না। কিন্তু সে যে জেগে আছে তাতে সন্দেহ নেই। কম্বলের ওপর থেকে বেশ বোঝা যায় সে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে আর মাঝে মাঝে পা নাড়ছে! অরবিন্দ আরও লক্ষ্য করল, লোকটা অসাধারণ লম্বা; প্রায় সারা বেঞ্চিটার এমুড়ো থেকে ওমুড়ো পর্যন্ত জুড়ে শুয়ে আছে।

কয়েক মিনিট পরে ট্রেন আবার চলতে আরম্ভ করল। অরবিন্দর একটু গরম বোধ হতে লাগল, কারণ দরজা জানালা সবগুলোরই কাঁচের শার্সি তোলা রয়েছে। অরবিন্দ নিজের দিকের একটা কাঁচ নামিয়ে দিয়ে কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

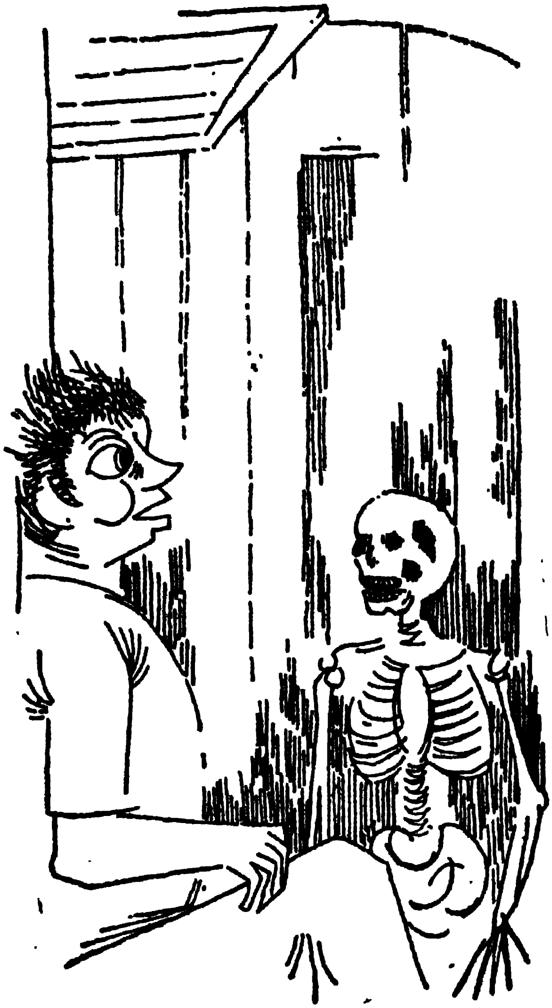
ট্রেন ছুটে চলেছে। তার মৃদু মৃদু আলো আর একটানা ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে অরবিন্দর চোখ জড়িয়ে আসতে লাগল। র‍্যাপারের ভেতরটা বেশ আতপ্ত হয়ে উঠেছে; কানের পাশ দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ার যে স্রোত বয়ে যাচ্ছে তাও ভারি মিষ্টি লাগছে....অরবিন্দ কয়েকবার এই ট্রেনে যাতায়াত করেছে; তার যাত্রাপথ বেশি লম্বা নয়, মাত্র পাঁচ-ছয় ঘণ্টার পথ। কাল ভোর হতে না হতেই সে হাওড়া পৌঁছে যাবে...

'ওহে ছোকরা, শুনছ?'

চট্‌কা ভেঙে গেল। অরবিন্দ চোখ চেয়ে দেখল, মাঝের বেঞ্চির লোকটা তার দিকে পাশ ফিরে শুয়েছে, আর মুখের কম্বল একটু তুলে কথা বলছে। অরবিন্দ কম্বলের অন্ধকারে তার মুখ দেখতে পেল না, কেবল খটখটে শুক্‌নো আওয়াজ শুনলো—'জানালাটা খুলে দিলে কেন? রক্ত বেশি গরম বুঝি? এদিকে আমার যে হাত কালিয়ে গেল।'

লোকটার কথা বলার ধরন বড় রুক্ষ্ম। অরবিন্দ মনে মনে একটু বিরক্ত হল, কিন্তু জবাব না দিয়ে চিৎ হয়ে শুলো। সে নিজের দিকের জানালা খুলেছে তাতে ওর কি? ওর যদি এতই শীত করে, ও অন্যদিকের বেঞ্চিতে গিয়ে শুলেই পারে।

সাড়া না পেয়ে লোকটা ধমক দিয়ে বলল,—'কথা কানেই যাচ্ছে না! জান্‌লা বন্ধ করে দাও। শুনছ?'



এবার অরবিন্দ চুপ করে রইল, এই অভদ্র হুকুমের জবাব দিতে তার প্রবৃত্তি হল না। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর কম্বলের মধ্যে থেকে একটা খটখট শব্দ এল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা লম্বা হাত বেরিয়ে এসে অরবিন্দর নাকের ওপর দিয়ে জানালার কাঁচ তুলে দিতে লাগল।

অরবিন্দ দেখল হাতটা রলার মত সরু আর বরফের মত সাদা—হাতে চামড়া বা মাংসের নামগন্ধ নেই, স্রেফ হাড়। জানালার কাঁচ নামিয়ে দিয়ে হাতটা আবার কম্বলের মধ্যে ফিরে গেল।

অরবিন্দ বুঝতে পারল, যে ব্যক্তি তাব পাশে শুয়ে আছে, সে মানুষ নয়। সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, প্রেত কম্বলের ফাঁক দিয়ে তার পানেই তাকিয়ে আছে। তারপর তার গলা শুনতে পেল—'ভাল কথায় বললুম, তা হল না। এখন বুঝতে পারছ আমি কে? কার সঙ্গে একলা চলেছ?'

এরকম কথা শুনলে কার না বুক গুরগুর করে ওঠে? কিন্তু অরবিন্দ বেশ সহজ ভাবেই উত্তর দিল,—'আমাব মনে হচ্ছে—আপনি ভূত।'

ভূত উঠে বসল। তখন তার কঙ্কালসার চেহারাটা দেখা গেল। সে গায়ে কম্বলটা জড়িয়ে শুধু মুণ্ডটি বার করে অরবিন্দের পানে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। তার চক্ষুকোটব শূন্য বটে, কিন্তু তবু মনে হয় তার দেখবার ক্ষমতা আছে: মাংসহীন মুখের দাঁত বার করা হাসিটাও সব সময় হাসি বলে মনে হয় না, মনে হয় যেন কখনও প্রেত গম্ভীর হয়ে রয়েছে, কখনও বা রাগে দাঁত কড়মড় করছে।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সে বলল,—'আমাকে দেখে তোমার ভয় করছে না?'

অরবিন্দ অবাক হয়ে বলল—'ভয় করবে কেন? আপনিও তো আমারই মতো, শুধু আপনার গায়ে মাংস নেই এই যা তফাৎ।'

মনে হল যেন ভূতের চক্ষু কোটরের মধ্যে চোখ দুটো বন্‌বন্ করে ঘুরতে লাগল। তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে সে চলন্ত গাড়ির মধ্যে নাচতে আরম্ভ করে দিলে। সে কী বিকট নাচ! উদোম একটা কঙ্কাল হাত-পাগুলোকে এঁকিয়ে বেঁকিয়ে খটখট শব্দে তালি দিয়ে নাচতে শুরু করে দিলে। রেলের লোহালক্কড়ের শব্দের সঙ্গে কঙ্কালের হাড় পাঁজরার আওয়াজ সঙ্গৎ করতে লাগল—ঝমঝম ঝমাৎ।

অরবিন্দ ভারি আগ্রহের সঙ্গে শুয়ে শুয়ে নাচ দেখতে লাগল। শেষে বোধ হয় নেহাৎ ক্লান্ত হয়েই ভূত আবার বেঞ্চিতে এসে বসল।

অরবিন্দের কৌতূহল হল, সে জিজ্ঞেস করলে—'আপনি হঠাৎ নাচলেন কেন?'

কঙ্কাল কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে বসে রইল, তারপর বিরক্ত ভাবে বলল—'আমার ইচ্ছে আমি নাচলুম—তোমার তাতে কি?'

অরবিন্দ সবিনয়ে অনুরোধ করল—'আর একটু নাচুন না!'

এবার কঙ্কাল উঁচু দিকে মুখ তুলে হা হা ক'রে হেসে উঠল। তারপর হাসি থামিয়ে প্রসন্ন স্বরে বলল—'তুমি তো আচ্ছা ছেলে! এত ভয় দেখাবার চেষ্টা করলুম, তুমি একটুও ভয় পেলে না! দেখি তোমার নাড়ি।

অরবিন্দ নির্ভয়ে হাত বাড়িয়ে দিলে। কঙ্কাল তার নাড়ি টিপে দেখল, নাড়ী বেশ সহজ ভাবে চলছে।

অরবিন্দ বলল—'উঃ, আপনার আঙুল কি ঠাণ্ডা!'

কঙ্কাল অরবিন্দর হাত ছেড়ে দিয়ে বলল—'তোমার মতো ছেলে আমি দেখিনি। আচ্ছা, এবার জানলা খুলে দাও। আমারও একটু গরম বোধ হচ্ছে?

অরবিন্দ উঠে বসে জানালা খুলে দিতে দিতে বলল—'নাচে খুব পরিশ্রম হয় কিনা। শুনেছি ফুটবল খেলতেও এত হয় না। আচ্ছা আপনি ট্রেনে চড়ে কোথায় যাচ্ছেন?'

ভূত একটু চুপ করে থেকে বলল—'কোথাও যাচ্ছি না—মাঝে মাঝে এই ট্রেনে যাতায়াত করি। আজ কি তিথি জানো?

'না।'

ভূত একটু বিমর্ষ ভাবে বলল—'আজ কৃষ্ণা একাদশী। কিছুক্ষণ বাদেই চাঁদ উঠবে। তোমার কাছে সিগারেট আছে? দাওনা একটা, বড় খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

'সিগারেট তো আমি খাই না তবে সুপুবি লবঙ্গ আছে, যদি চান তো দিতে পারি।'

'তাই দাও, অনেকদিন খাই নি।'

অরবিন্দ পকেট থেকে একমুঠো সুপুরি লবঙ্গ বার করে তাকে দিলে, কঙ্কাল তাই মুখে ফেলে চিবোতে লাগল।

তার দিকে চেয়ে অরবিন্দর মনে অনেক প্রশ্ন আসতে লাগল; সে বালিসে হেলান দিয়ে বলল—'আচ্ছা, আপনারা শুনেছি অশরীরী। তবে এ কঙ্কাল কোথায় পেলেন?'

ভূত যেন একটু বিরক্ত হয়ে বলল—'এ আমার নিজেব কঙ্কাল—ধার করা জিনিস নয়। আমরা অশরীরী বটে কিন্তু সুযোগ পেলে মূর্তি ধারণ করতে পারি।'

'কিন্তু কেন ধারণ করেন? ভাল লাগে বুঝি?'

'হুঁ। অশরীরী অবস্থায় মানুষ-জীবনের সব স্বাদ পাওয়া যায়। তীব্র কিছুর স্বাদ পেতে হলে শরীর চাই।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তাবপর অববিন্দ আবাব প্রশ্ন করল,—'আচ্ছা আপনি রেলের টিকেট কিনেছেন?'

ভূত মাথা নেড়ে বলল—'উহুঁ—ডাব্‌লুটি।'

'যদি টিকিট-চেকার ধরে?'

ভূত বুকে ঘাড় গুঁজে কিছুক্ষণ ফিক্ ফিক্ করে হাসল, তাবপর বলল—'একবার এক টি টি আই উঠেছিল। ট্রেন তখন চলতে আরম্ভ করেছে। আমার কাছে টিকেট চাইলে, আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম, সাড়া দিলুম না। সে আমার বুকের ওপর টোকা মেরে কড়া সুবে টিকেট চাইলে। তবু সাড়া দিলুম না। সে তখন কম্বল তুলে আমার মুখ দেখলে—হি হি হি—'

'মুখ দেখে কি করল?'

'বাবা রে' বলে চিক্কুড় ছেড়ে চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ল।'

'তারপর?'

'সেও ভূত হয়েছে। কিন্তু ট্রেনে চড়তে চায় না, বলে, অরুচি ধরে গেছে।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। ট্রেন হু হু করে ছুটে চলেছে; গম গম শব্দে একটা পুল পাব হয়ে গেল।

ভূত হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—'কটা বেজেছে?'

অরবিন্দ কব্জির ঘড়ি দেখে বলল—'বারোটা পঁচিশ।'

ভূত বলল—'হুঁ। এখনো দেরি আছে।'

সে কম্বল গায়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল।

ভূত আর মানুষ পাশাপাশি শুয়ে আছে। ভূত মাথার নিচে একটা হাত দিয়ে যেন আলোর দিকে চেয়ে আছে। কি ভাবছে সেই জানে। অরবিন্দর চোখ আবার বুজে আসতে লাগল। বেশি রাত জাগা তার অভ্যাস নেই।

তারপর কতক্ষণ কেটে গেছে হিসেব নেই। মাঝে গাড়ি দু একটা ইস্টিশানে থেমেছে, আবার চলেছে। হঠাৎ